আমি কিভাবে বরকত হাসিল করব?
ড. আল বিন নুফাই' আল 'আলাইয়ানী
তাওহীদ

আমি কিভাবে বরকত হাসিল করব?

ডঃ আলী বিন নুফাই' আল-'আলাইয়ানী

আমি কিভাবে বরকত হাসিল করব?

মূলঃ ডঃ আলী বিন নুফাই' আল-'আলাইয়ানী

অনুবাদঃ মুখলিসুর রহমান মানসূর

প্রথম প্রকাশঃ মে ২০১৩

প্রকাশনাঃ
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

ISBN: 978-984-90229-1-6

মূল্যঃ ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র।

মুদ্রণ:
হেরা প্রিন্টার্স.
৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকের অভিমত

التبرك المشروع والتبرك الممنوع

(আমি কিভাবে বরকত হাসিল করব?)

উক্ত পুস্তকটির সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিল। তাই পুস্তকটির আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পড়ে দেখেছি। এতে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং অনুবাদের মানও ভাল হয়েছে, যা মুদ্রণের জন্য উপযোগী।

আমি পুস্তকটির মুদ্রণ ও বহুল প্রচার কামনা করছি। যাতে করে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাই-বোনেরা উপকৃত হতে পারেন।

আহ্‌কার

এরফান বিন আব্বাস

দায়ী ও শিক্ষক হালী-সুফ্‌ফা ইসলামী দাওয়াহ্ সেন্টার,

সৌদি আরব।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করতঃ তাঁর নিকটে ক্ষমা ও সঠিক পথের সন্ধান কামনা করছি। আমরা আমাদের আত্মার অনিষ্ট এবং অসৎ কর্মসমূহ থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়েত দান করেন অন্য কেউ তাকে পথ ভ্রষ্ট করতে পারবে না: এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ বা ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর সৎ ব্যক্তি, তাঁদের স্মৃতি, তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত সময় ও স্থানসমূহের মাধ্যমে বরকত লাভ করা আক্বীদার (মৌলিক বিশ্বাস) বিষয়াবলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ী বা অতিরঞ্জন ও সত্যের বিরোধীতা পূর্বের অনেক লোককে বিদআত, নানাবিধ অপকর্ম এর্ব শিরকের গভীরতা ও ভয়াবহতার প্রতি ধাবিত করেঅতঃপর সৎ ব্যক্তি; তাঁদের স্মৃতি; তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত সময় ও স্থানসমূহের মাধ্যমে কবরকত লাভ করা আক্বীদার (মৌলিক বিশ্বাস) বিষয়াবলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন ও সত্যের বিরোধিতা পূর্বের অনেক লোককে বিদআত, নানাবিধ অপকর্ম এবং শিরকের গভীরতা ও ভয়াবহতার প্রতি ধাবিত করেছে। এটা যুগ যুগ ধরে ঘটে আসছে। কেননা, জাহিলিয়াত বা মূর্খতার যুগে রাসূল ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন। তখনকার (সে সময়ের) লোকেদের মূর্তি পূজা করার অন্যতম কারণ ছিল সেগুলোর (মূর্তির) মাধ্যমে বরকত হাসিল করা এবং ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও নিজেদের ব্যাপারেও ঐ সকল মূর্তির বরকত প্রার্থনা করা।

পরবর্তী যানাদেক্বাহ (যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, বাইরে ইসলাম প্রকাশ করলেও ভিতরে কুফরী গোপন করে রাখে) ও মুনাফিক্বদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে বিদআত প্রবেশ করেছে।

দ্বীন বা ধর্মকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের অন্যতম হাতিয়ার বা মাধ্যম ছিল: আল্লাহর ওলী ও সৎ ব্যক্তিদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন এবং তাঁদের ক্ববরের মাধ্যমে বরকত লাভ করা।

এ সকল গোমরাহ্ ও বিপথগামী সম্প্রদায়ের সূচনাতে রয়েছে রাফেযা (শিয়াদের একটি দল)। কেননা রাসূল ﷺ এর আগমনের পর বা উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার মাঝে পথভ্রষ্ট জামাত হিসেবে এ রাফেযাদেরই সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহঃ বলেন: এ রাফেযাদের মাধ্যমেই বা তাদের পথ ধরেই মুনাফিকরা ইসলামের মাঝে বিভিন্ন প্রকার ভেজাল ও গোমরাহীর অনুপ্রবেম ঘটিয়েছে। কেননা, রাফেযা মতবাদের আবিষ্কারক হচ্ছে একজন নাস্তিক ইহুদী। বাহ্যিকভাবে সে ইসলাম প্রকাশ করলেও অন্তরে সে কুফরী গোপন করে রেখেছিল। যাতে করে ইসলামে ভেজাল প্রবেশ করানো ও মুসলমানদের মাঝে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করা তার জন্য সহজ হয়। যেমনভাবে পলস বা বোলস খৃষ্টানদের ধর্মে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। সে (ঐ ইহুদী) মুসলমানদের মাঝে ফিৎনা বা ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা চালায় এমনটি পরিশেষে তাদের হাতেই ইসলামের তৃতীয় খলীফা উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাত বরণ করেন।

মুমিনদের মধ্য থেকে যাঁরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন তারাও এ ফিৎনায় পড়ে গেছেন।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَاأَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ج وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٤٧)

তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত তাহলে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই বাড়াত না আর তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত, আর তোমাদের মাঝে তাদের কথা শুনার লোক আছে। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবহিত আছেন।

(সূরা আত্-তাওবাহ: ৪৭)

যখন মুসলমানগণ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েন তখন এ ইহুদী আমীর হওয়ার জন্য কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট দলীল থাকা ও উক্ত ব্যক্তির নিষ্পাপ হওয়ার মাসআলার আবির্ভাব ঘটিয়ে মানুষদেরকে এর প্রতি আহ্বান জানায়।

সে আবূ বকর ও উমার (রাঃ) এর মত সাহাবীদ্বয়ের বিরুদ্ধে বা তাঁদের সম্মানহানিকর কথাবার্তা বলতে শুরু করে। আকস্মিকবাবে তা ঐ সকল লোকেদের অন্তরে স্থান করে নেয় যারা মূলতঃ এ ব্যাপারে অজ্ঞতা বশতঃ নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, যদিও তারা কাফির হয়ে যায় নি।

ফলে পক্ষাবলম্বন করা ও কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুসরণ করার বিদআত পৃথিবীতে প্রকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে যানাদেক্বরা (নাস্তিকরা) যখন তাদের অবস্থান দৃঢ় করে নেয় তখন তারা শহীদগণের কবরে গম্বুজ নির্মাণ, তা পাকাকরণ এবং মসজিদগুলোকে পরিত্যাগ করার আদেশ দেয়। তারা এর পক্ষে এ যুক্তি পেশ করে যে, মা'সূম বা নিষ্পাপ ব্যতীত কারও পিছনে জুমুআহ্ ও জামা'আতে সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

মিথ্যা ও অন্যায়ভাবে তারা এ সকল গম্বুজগুলোতে বাতি জ্বালানো, তার সম্মান করা এবং সেখানে প্রার্থনার কথা মানুষের মাঝে প্রচার করতে লাগল। আমার জানা মতে আহলে কিতাবের কোন ব্যক্তি তাদের মত মিথ্যা তৈরী করেনি এবং তার আশ্রয় নেয়নি। অর্থাৎ মিথ্যার ক্ষেত্রে তারা আহলে কিতাবকেও ছাড়িয়ে গেছে। (উল্লেখ্য: আহলে কিতাবরা- ইহুদী-নাসারারা নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাদের উপর নাযিলকৃত গ্রন্থসমূহের প্রচুর পরিবর্তন সাধন করে। এমনকি তাদের (যানাদেক্বদের) গুরু ইবনে নুমান মাজার পূজার নিয়ম পদ্ধতির উপর একটি বই রচনা করে। তাতে তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর অসংখ্য মিথ্যারোপ করতঃ তার মাধ্যমে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্ম ও মিল্লাতকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারাই তাওহীদ বিরোধী শিরকের নতুন সূচনা করে। ফলে তারা শিরক ও মিথ্যা উভয় পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

অতঃপর রাফেযাদের মধ্য হতে অতিরঞ্জনকারী সূফীবাদীরা মাশায়েখ এবং তাদের কবর ও স্মৃতিসমূহের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা শুরু করে দেয়। তাদের দলভুক্ত বুসীরির মত হলো, যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের মাটির দ্বারা বরকত হাসিল করবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য আশীর্বাদ বা সুখের কারণ হয়ে যাবে। সে বলছে:

لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه

طوبى لمنتشق منه وملتهم

অর্থ: কোন মাটি রাসূল ﷺ এর কবরের মাটি সমতুল্য হতে পারে না যে ব্যক্তি তাঁর ﷺ এর কবরের মাটির ঘ্রাণ নেয় অথবা তা নিজ চেহারায় আচ্ছাদিত করে সে সৌভগ্যশীল এবং এটা তার জন্য কতইনা উত্তম ও কল্যাণকর। (নাক্বদুল বুরদাহ ৮২ পৃঃ, লেখক: আব্দুল বাদী)

রেফায়ী সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাদের দলনেতার এমন সব বরকতের কথা উল্লেখ করেছে যাতে সে তার গুণের দ্বারাই জ্বলজ্বল করছে।

যেমন: রেফায়ী তার কবিতায় নিজেই লিখেছে: আমি রেফায়ী ভীত সন্ত্রস্তদের আশ্রয় স্থল, অতএব তুমি আমাতেই আশ্রয় গ্রহণ কর। আমার কল্যাণের দরজা সর্বদা সকলকে সিক্ত করে।

আমার মুরীদ যদি সমুদ্রের অতলতলে আমাকে ডাকে তবে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। আমার মহা সম্মানের রাজত্বের নব রবি বিশ্ববাসীর সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমার অবস্থা অন্যান্য সকল জাতি হতে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে।

যদি শস্যহীন যমীনে আমার স্মরণ করা হয় বা আমাকে ডাকা হয় তবে সেখানে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণ ও নিয়ামত আসবে।

আগুনে যদি কেউ আমাকে স্মরণ করে তবে সে তাতে ধ্বংস হবে না। যদি সমুদ্রে আমার স্মরণ করা হয় তবে আমার সম্মানের কারণে সমুদ্র শুকিয়ে শুন্য হয়ে যাবে। (রেফায়ীইয়্যাহ ৮৮পৃঃ, লেখক, আব্দুর রহমান দিমাশক্বিয়্যাহ)

নাক্বশা বন্দিয়াহ তরীকার শাইখ ব্যতীত অন্য কেউ এ সকল বরকতের ক্ষেত্রে রেফায়ীর মত উঁচু পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। সেই নাক্বশা বন্দিয়াহ্ তরীকার শাইখের ব্যাপারে মুহাম্মাদ আমীন কুরদী বলছে: সে হচ্ছে মহান ত্রাণকর্তা, সে মারেফতের সকল নিয়ম নীতিগুলোকে এক গ্রন্থিতে জমা করেছে। তার হিদায়েতের আলোতে হিংসুকদের চোখগুলো হারিয়ে গেছে বা তারা তাদের চোখ হারিয়ে ফেলেছে। তার গোপন ভেদের বরকতে ভাল লোকেদের মধ্যে যারা তার অকল্যাণ চেয়েছিল তারা তার পক্ষে ফিরে আসে। অপরদিকে ভারতে বেরলভী দলনেতার ফতোয়া হলো, কেউ যদি বরকত হাসিলের জন্য বাড়ী বা ঘরে হুসাইন (রাঃ) এর মূর্তি রাখে তাতে কোন অসুবিধা নেই! বর্তমান যুগে ইলম বা জ্ঞানের প্রচুর বিস্তার

সত্ত্বেও আওলিয়া, তাদের স্মৃতি, কবর এবং কবরের অধিবাসীদের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা চালুই রয়ে গেছে। এমনকি অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকেদের মাঝেও তা প্রচলিত আছে।

নাজাফ এলাকার মাটির দ্বারা তৈরীকৃত পাথর যা রাফেযাদের হাজীরা সালাতের সময় তার উপর সিজদাহ করার জন্য বেয়ে নিয়ে বেড়ায় তা নিষিদ্ধকৃত বরকত হাসিলের অন্যতম পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছু নয়।

মিলাদকারীদের মিলাদ পড়ার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং মিলাদ যে পড়ায় তার পাশে রাখা পানি থেকে সকলের পানি পান করাও হারাম ও নিষিদ্ধ বরকত হাসিলের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা, তাদের অনেকে বিশ্বাস করে যে, উক্ত মিলাদ মাহফিলে রাসূল ﷺ এর রূহ উপস্থিত হয়ে মিলাদ পাঠকারী মৌলভী সাহেবের নিকটে রাখা পানি হতে পান করে, অতঃপর তারা অবশিষ্ট পানি দ্বারা বরকত হাসিল করে।

এজন্য আমি আমার দৃষ্টিতে আক্বীদার এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে হক্ব বা সত্য প্রকাশে অংশগ্রহণের বাপারে প্রয়োজন অনুভব করলাম। যাতে বৈধ ও অবৈধ বরকত অর্জনের মাঝে সংমিশ্রণ না হয়ে যায়।

বক্ষমান বইটি আমি একটি ভূমিকা, দু'টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে সাজিয়েছি। ভূমিকাতে تبرك বা বরকত হাসিলের অর্থ ও তার গূঢ় রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রারম্ভিকা

تبرك **তাবাররুকের অর্থ ও প্রকৃত অবস্থা:** লিসান অভিধানে বলা হয়েছে, লায়স রহ. تبارك الله তাবারাকাল্লাহু এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: এর অর্থ হলো: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুউচ্চ ও বড়ত্বের অধিকারী। تبارك بالشيئ (তাবারাকা বিশ্‌শাইয়ি) বা কোন জিনিসের মাধ্যমে বরকত হাসিলের অর্থ ঐ জিনিসের মাধ্যমে কোন বস্তুর আশাবাদী হওয়া বা শুভ কামনা করা।

যুজাজ রহ. আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: মুবারাক (বরকতময়) তিনিই যাঁর পক্ষ থেকে অনেক কল্যাণ এসে থাকে। তিনি এটাও বলেছেন যে, অনেকের কথা تبركت به এর অর্থ হলো: আমি তার দ্বারা শুভ কামনা করেছি বা বরকত লাভ করেছি।

রাগেব রহ. বলেছেন: البركة (আল-বাকাকাহ্) শব্দের অর্থ হলো, কোন বস্তুতে মহান আল্লাহর কল্যাণ স্থায়ী হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন: لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ অর্থ: অবশ্যই আমি আসমান ও যমীন হতে তাদের উপর স্থায়ী কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিব। বরকতকে বরকত বলে নামকরণের কারণ হলো: তাতে কল্যাণ রয়েছে। যেমন বলা হয়: ثبوت الماء في البركة বা পুকুরে স্থায়ীভাবে পানি থাকা। মুবারাক হলো ঐ বস্তু যার মধ্যে ঐ কল্যাণসমূহ পাওয়া যায়। আল্লাহর কল্যাণ এমন স্থান থেকে এসে থাকে যা বুঝা যায় না। অন্য ভাষায় আধিক্যতার দরুন তা গণনা করা যায় না। অনুভূতি ছাড়া যা বৃদ্ধি হয় সে বস্তুর ব্যাপারে বলা হয় তা হচ্ছে মুবারাক (বরকতময় বা বরকতপূর্ণ) এবং তাতে কল্যাণ রয়েছে। ইবনে ক্বাইয়্যেম রহ. তাঁর কিতাবুশ শরহে তাশাহুদের (তাশাহুদের ব্যাখ্যা নামক গ্রন্থে) রাসূল ﷺ এর বাণী: اَللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ (সহীহুল বুখারী ১১/১৫৬) بركة (বারাকাহ)শব্দের উল্লেখ করতঃ বলেন: বরকতের প্রকৃত অবস্থা হলো, স্থায়ীভাবে সুসাব্যস্ত ও অবিচল থাকা। এখান থেকেই বলা হয় برك البعير বা উটের বসা এটা তখনি বলা হয় যখন উট যমীনে ভালভাবে বসে যায়। এখান হতে বলা হয়: المبارك বা الموضع المبروك তথা বরকতপূর্ণ স্থান। যে বস্তু স্থায়িত্ব লাভ করে তাকে ই বলা হয় برك

البرك বলা হয় অধিক সংখ্যক উটকে। بركة বলা হয় হাউজ জাতীয় জিনিষকে, আর বহু বচন হচ্ছে বুরূক, ইমাম জাওহারী তা উল্লেখ করেছেন।

বলা হয়েছে: بركة এর দ্বারা এজন্য নাকরণ করা হয়েছে যে, সেখানে সর্বদা পানি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। البركاء বলা হয় যুদ্ধে মজবূত অবস্থানে থাকা এবং তাতে প্রচেষ্টা চালানোকে। কবি বলেন ولا ينحجي من العمرات إلا براكا القتال أو الفرار অর্থ: যুদ্ধের ময়দানে মজবুত অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করা অথবা পলায়ন ব্যতীত কেউ মৃত্যু হতে রেহাই পায় না।

البركة শব্দের অর্থ, বৃদ্ধি বা বেশি হওয়া সেখান থেকে تبريك এর অর্থ হলো কোন বস্তুর বৃদ্ধির জন্য দুয়া করা। যেমন বলা হয়, بارك الله وبارك فيه، وبارك عليه وبارك له আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন অর্থাৎ আল্লাহ তা বৃদ্ধি করুন। এমনিভাবে কুরআনে বলা হয়েছে: بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থ: বরকত প্রাপ্ত বা ধন্য হয়েছে যে এই অগ্নির মধ্যে এবং যারা তাঁর পাশে রয়েছেন। (সূরা নামল আয়াত ৮)

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে: (وباركنا عليه وعلى إسحاق) অর্থ: আমি ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আলাইহিমাসসালাম) কে বরকত দান করেছিলাম। সূরা আস-সাফ্‌ফাত আয়াত নং ৩৭।

আল্লাহ বলেন: وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ অর্থ: আমি ইবরাহীম এবং লূত আঃকে উদ্ধার করে এমন ভূমিতে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি বরকত দান করেছি। সূরা আম্বিয়া আয়াত ৭১। হাদীসে এসেছে:

وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ (بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٠٨/١)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা দান করেছো তাতে বরকত তথা বৃদ্ধি দান কর।

সাদা (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

অর্থ: আল্লাহ তোমার পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদে বরকত দান করুন। (সহীহুল বুখারী ৭/১৯৯)

মুবারাক বলা হয় তাকেই যাকে আল্লাহ বরকত দান করেছেন। যেমন : তিনি ঈসা আঃ এর ভাষায় বলেন:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ অর্থ: আমি যেখানেই থাকি না কেন আল্লাহ আমাকে সেখানেই বরকতপূর্ণ করেছেন।

(সূরা মারইয়াম আয়াত নং ৩১)

আল্লাহ কিতাবও বরকতময়। সূরাহ আম্বিয়ার ৫০ আয়াতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ অর্থ: ইহা (আল-কুরআন) হলো সেই কল্যাণময় উপদেশ যা আমি অবতীর্ণ করেছি।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ অর্থাৎ আমি আপনার নিকটে বরকতপূর্ণ কিতাব (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি- সূরাহ সোয়াদ আয়াত ২৯। অন্যান্য বস্তুর চেয়ে কুরআনকে মুবারাক বা বরকতময় বলে নামকরণ করা অধিক যুক্তিপূর্ণ কেননা, তাতে রয়েছে ব্যাপক কল্যাণ ও বিভিন্ন প্রকার রবকত। আল্লাহর ক্ষেত্রে مبارك এর পরিবর্তে تبارك বলতে হবে। মুবারাক বলা যাবে না। একদল উলামা তাদের মধ্যে জাওহারী বলেন: তাবারাকা শব্দের অর্থ হলো بارك (বারাকা) বা তিনি রবকত দান করেছেন। যেমন বলা হয়: قاتل وتقاتل ।

জাওহারী বলেন: فاعل মুতাআদ্দী হয় তথা তা ক্রিয়া ও কর্তা হতে বের হয়ে অন্য বস্তুর সাথে (মাফউল) মিলিত হয়, কিন্তু تفاعل শব্দের ওজনে যে ক্রিয়াগুলো আসবে তা মুতাআদ্দী হয় না। অর্থাৎ ক্রিয়া ও কর্তা মিলে বাক্য শেষ হয়ে যায়। মূলতঃ বিশ্লেষকদের নিকটে উপরোক্ত কথাটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কেননা, তাবারাকা শব্দটি আল-বারাকাহ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে যা আল্লাহর প্রশংসার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এটা (তাবারাকা) এমন একটি গুণ যা আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে। যেমন: تعالى (সুউচ্চ) শব্দটি।

তা'আলা শব্দটি العلو মূল ধাতু হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্যই এ শব্দ দু'টিকে একত্রে ব্যবহার করতঃ বলা হয় تبارك وتعالى। তেমনিভাবে দু'আ কুনূতে বলা হয়: تباركت وتعاليت অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি বরকতময় এবং সুউচ্চ ও সু-মহান।

আর এ উভয় গুণে (تبارك وتعالى) গুণান্বিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক হক্বদার এবং যোগ্য। কেননা, সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতেই রয়েছে এবং সকল কল্যাণ তাঁর নিকট থেকেই আসে।

আল্লাহর সকল গুণাবলী পরিপূর্ণ, কোন ঘাটতি বা অপূর্ণতা নেই তাঁর সকল কর্মই হিকমত, রহমত বা দয়া এবং কল্যাণে পরিপূর্ণ। কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে তখন আমরা বলে থাকি: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته অর্থ: আপনার উপরে আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

বরকতের প্রকার:

বরকত মূলত: দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: এটা সেই বরকত যা মহান রব্বুল আলামীনের কাজ বা কর্ম।

بركة শব্দ হতে ক্রিয়া ব্যবহার হয়: بارك যা কখনো নিজেই মুতাআদ্দী হয়। কখনো على বা في অক্ষরের মাধ্যমে মুতাআদ্দী হয়। এর মাফউল বা কর্মপদ হচ্ছে মুবারাক (বরকতময়) অর্থাৎ যাকে বরকত দেয়া হয়েছে। অতএব, সে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে বরকত প্রাপ্ত।

দ্বিতীয় প্রকার: এমন বরকত যা আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। দয়া এবং মর্যাদার সম্বন্ধ। আর এর ক্রিয়া ব্যবহার হয় تبارك (বরকতময়) এজন্য তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে বলা হয় না এবং তা মহান রব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করাও বৈধ নয়।

সেহেতু তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন বরকত দাতা, তাঁর বান্দা এবং রাসূলগণ হলেন বরকতময় বা বরকত প্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঈসা আঃ এর ভাষায় বলেন:

(وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ) আমি যেখানেই থাকিনা কেন আল্লাহ আমাকে বরকতময় করেছেন। অতএব, আল্লাহ যে জিনিসে বা যে ব্যক্তির উপরে বরকত নাযিল করেছেন সেটাই মুবারাক বা বরকত তথা বরকতময়।

কিন্তু আল্লাহর গুণ তাবারাকা তা কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই খাস অন্য কারও ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ্ তাঁর নিজের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতেই তাবারাকা শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

যেমন তিনি বলেন: تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ অর্থ: বরকতময় সেই সত্ত্বা যিনি সারা বিশ্বের মালিক বা পালনকর্তা।

পবিত্র কুরআনে تبارك শব্দের ব্যবহার:

আল্লাহ تعالى বলেন: تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ বরকতময় সেই সত্ত্বা যাঁর হাতে সব কিছুরই মালিকানা রয়েছে। (সূরাহ্ মুলক আয়াত নং ১)

আরও বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে:

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

অর্থ: নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়।

(সূরাহ্ মু'মিনূন আয়াত নং ১৪)

وَتَبَارَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ج وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٨٥)

অর্থ: অতি মহান ও পবিত্র তিনি, আকাশ, পৃথিবী ও এ দু'য়ের মাঝে যা আছে তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব যাঁর হাতে, ক্বিয়ামতের জ্ঞান তাঁর কাছেই আছে (যে তা কখন ঘটবে), আর তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে- সূরাহ্ আয-যুখরুফ আয়াত ৮৫।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا لا (١)

অর্থ: পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হন- সূরাহ্ আল ফুরক্বান আয়াত ১।

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ لا وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا (١٠)

অর্থ: মহা কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাহ্র উপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কিতাব) নাযিল করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে- সূরাহ্ আ-ফুরক্বান আয়াত ১০।

تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا (٦١)

অর্থ: কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র- সূরাহ্ আল-ফুরক্বান আয়াত ৬১।

খেয়াল করে দেখুন: প্রতিটি স্থানে তাবারাকা শব্দটি কেবল মাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি সুবহানাহু ব্যতীত অন্যের ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়নি। তাবারাকা শব্দটি বরকতের ক্ষেত্রে ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: তা'য়ালা, তা'য়াযুম এবং অনুরূপ শব্দাবলী। তাবারাকা শব্দটি তা'য়ালা এর ওজনে এসেছে যা পরিপূর্ণ এবং সর্বাধিক উঁচু বা শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ দেয়। তেমনিভাবে তাবারাকা শব্দটিও আল্লাহর বরকতের পরিপূর্ণতা, আধিক্য ও ব্যাপকতাকে বুঝিয়ে থাকে। আর এ অর্থই বহন করে পূর্ববর্তী ঐ সালাফের উক্তি যিনি বলেছেন: তাবারাকা, তায়া'যামা অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যাপক বরকতের অধিকারী এবং সুমহান।

আরেকজন সালাফ বলেছেন: তাবারাকা এর অর্থ হলো, সকল প্রকার বরকত তাঁর পক্ষ হতে আসে। অনেকে বলেছেন: আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিজীবের প্রতি ব্যাপক দয়া ও কল্যাণ অবতীর্ণ করেন বলেই নিজেকে তাবারাকা নামে আখ্যায়িত করেছেন। কেউ বলেছেন: তাবারাকা অর্থ হলো: আল্লাহর রহমত ও দয়া তাঁর সৃষ্টিজীবকে বেষ্টন বা আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

কেউ বলেন: তাবারাকা অর্থ হলো: আল্লাহ্ সকল কিছুর অগ্রে রয়েছেন এবং তা থেকে তিনি তাঁর কর্ম ও গুণাবলীর ব্যাপারে সুউচ্চ ও মহান। এখান থেকেই বলা হয়েছে, তাবারাকার অর্থ হলো, তা'য়ালা ও তা'য়াযামা বা সুউচ্চ ও মহান। কেউ বলেছেন: তাবারাকা অর্থ তাক্বাদ্দাসা, আর আল-কুদ্দস অর্থ হলো পবিত্র। বলা হয়েছে: আল্লাহ্ তাঁর এই তাবারাকা নামের মাধ্যমেই সব কিছুতে বরকত দিয়ে থাকেন।

কেউ বলেন: তাবারাকা অর্থ হলো, ইরতাফায়া বা উঁচু হওয়া। এখান থেকে মুবারাক শব্দের অর্থ হলো যাকে উঁচু করা হয়েছে, এ অর্থ করেছেন ইমাম বাগাবী (রহঃ)। আরও বলা হয়েছে যে, তাবারাকা শব্দের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকলে তাঁর বরকত লাভ করা যায় বা বরকত লাভ হয়।

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তাবারাকা অর্থ হলো যিনি সকল প্রকার বরকত দান করেন।

কেউ বলেছেন: এমন বরকতময় সত্ত্বা যাঁর বরকত স্থায়ী থাকে, আছে এবং থাকবে। এ অর্থও করেছেন ইমাম বাগারী (রহঃ)।

প্রকৃত পক্ষে বরকত (আল-বারাকাহ্) শব্দেন মূল অর্থ হচ্ছে স্থায়ী ব্যাপক কল্যাণ। গুণগত এবং কর্মগতভাবে আল্লাহর চেয়ে এ নামের

অধিক হক্বদার আর কেউ নয়। সালাফগণের (পূর্ববর্তী হক্ব পন্থিগণ) ব্যাখ্যা এ দুটি অর্থই বুঝিয়ে থাকে।

তাবারাকা শব্দের মধ্যে এ গুণ দুটি (স্থায়ী ব্যাপক কল্যাণ) গুণগত ও ক্রিয়াগত দিক থেকে আবশ্যকীয়ভাবে সর্বদা বিদ্যমান থাকে। তবে শব্দ প্রয়োগের সময় গুণগত অর্থটিই অধিক উপযোগী (অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে)। কেননা গুণগত দিকটি লাযেম বা অকর্মক ক্রিয়া যেমন: تعالى (তা'য়ালা), تقدس (তাক্বাদ্দাসা) এবং تعاظم (তা'য়াযামা) শব্দসমূহ।

এ সকল শব্দের অর্থ এরূপ হয় না যে, মহান রব্বুল 'আলামীন অপরকে সুউচ্চ, মহাপবিত্র ও সুমহান করিয়াছেন। শব্দগত দিক থেকেও তা বুঝায় না; বরং তার অর্থ হচ্ছে যাঁর প্রতি এ সকল শব্দাবলী সম্বন্ধিত করা হয় তিনিই হচ্ছেন সুউচ্চ ও মহা পবিত্র। এমনিভাবে তাবারাকা শব্দের অর্থ বারাক ফি গাইরিহি বা অন্যকে বরকত দেয়া করাও ঠিক নয়। তাবারাকা এবং বারাকা শব্দের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তাবারাকা হচ্ছে লাযিম বা অকর্মক ক্রিয়া আর বারাকা হচ্ছে মুতা'আদ্দী বা সকর্মক ক্রিয়া।

অতএব, জানা গেল যারা তাবারাকা শব্দের অর্থ অন্যকে বরকত দেয়া করেছেন তারা সঠিক অর্থ করেননি। যদিও মহান রব্বুল আলামীনই বরকত দিয়ে থকেন, কেননা তিনিই হচ্ছেন বরকত দাতা।

তাবারাকা বা মহান রব্বুল আলামীন বরকতময় এটা মর্যাদাগত দিক থেকে। তাঁর মর্যাদা হচ্ছে বড়ত্ব, প্রশস্ততা এবং কল্যাণের গুণের ব্যাপক সমাবেশ। তিনি বারিকুন বা বরকত দাতা এটা দান ও নিয়ামত দেয়ার ক্ষেত্রে।

যেহেতু সকর্মক ক্রিয়া এ ব্যাপারে অকর্মক ক্রিয়াকে আবশ্যক করে কিন্তু অকর্মক ক্রিয়া সকর্মক ক্রিয়াকে আবশ্যক করে না, তাই কোন কোন সালাফ সকর্মক ক্রিয়া বা ফে'লে মুতা'আদ্দীর মাধ্যমে তাবারাকার অর্থ করেছেন যাতে উভয় অর্থ বুঝা যায়। তাই তারা বলেছেন: তাবারাকা অর্থ হলো: সকল প্রকার বরকত (কল্যাণ) আল্লাহর পক্ষ হতে আসে অথচ তা (উপরোক্ত অর্থ) আল্লাহর ক্ষেত্রে তাবারাকা এর একটা অংশ মাত্র। এ ব্যাপারে আমি আল-ফাতহুল মাক্বী কিতাবে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা লিখেছি, সকল প্রকার বরকতের মালিক ও উৎস হলেন মহান রব্বুল আলামীন। তাই তিনি মুবারিক বা বরকতদাতা। আর যাকে তিনি বরকত দিয়ে থাকেন তাকে বলা হয় মুবারাক বা বরকত প্রাপ্ত।

এজন্য আল্লাহর মহা গ্রন্থ আল-কুরআন, তাঁর রাসূল ﷺ, তাঁর ঘর (কাবা শরীফ) এবং ঐ সকল সময় ও স্থান যেগুলোকে তিনি সম্মানিত করতঃ অন্য সময় ও স্থান হতে খাস করেছেন এসব কিছুই মুবারাক বা সেগুলোতে তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বরকত দান করেছেন। এ সূত্র ধরেই লাইলাতুল ক্বদর, মসজিদে আক্বসার আশে পাশের এলাকা, সিরিয়ার ভূখন্ড যাকে আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে চার বা পাঁচ স্থানে বরকতপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন, এসব কিছুই বরকতপূর্ণ। সহীহ মুসলিমে সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ এর কথার প্রতি খেয়াল করুন, রাসূল ﷺ সালাতের পর বলতেন:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(صحيح مسلم ٣/٣٠٤)

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, সকল প্রকার শান্তি আপনার পক্ষ হতেই আসে। হে বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী আপনি বরকতময় এবং সকল প্রকার বরকত আপনার পক্ষ থেকেই আসে।

এ হাদীসের শব্দগুলোর প্রতি খেয়াল করলে দেখা যায় আল্লাহর দুই প্রকার প্রশংসা তাতে খুব সুন্দরভাবে একত্রিত হয়েছে, অর্থাৎ একদিকে এখানে আল্লাহর নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে, অপরদিকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা ও বড়ত্ব ঘোষণা করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালাই হচ্ছেন সালাম বা শান্তি দাতা, তাঁর পূর্ণতা, বড়ত্বের গুণাবলি, তাঁর কর্ম ও নামসমূহ সব কিছুই সালাম বা শান্তি ময়। এমনিভাবে গুণগত ও মালিকানার দিক থেকে তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী। সেহেতু সত্ত্বাগতভাবে তিনি মাহমুদ বা প্রশংসিত। তিনি নিজের ইচ্ছায় তাঁর স্বীয় কোন বান্দাকে তাঁর পক্ষ হতে প্রশংসা দিয়ে প্রশংসিত করে থাকেন। এমনিভাবে বিশেষণ ও মালিকানার দিক থেকে সকল প্রকার ইজ্জত ও সম্মানের মালিক হলেন মহান রব্বুল আলামীন। অতএব, আল্লাহর চেয়ে সম্মানিত কোন কিছু নেই। বান্দার যে সম্মান রয়েছে তা আল্লাহরই দান। এমনিভাবে গুণগত ও মালিকানার দিক থেকে সকল প্রকার রহমতের মালিক হলেন মহান রব্বুল আলামীন। অনুরূপভাবে সকল প্রকার বরকতের মালিক হলেন মহান রব্বুল আলামীন,

সেহেতু তিনি হলেন যাত বা সত্ত্বাগতভাবে বরকত দাতা, যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে বরকত দান করে থাকেন। এই বরকতের মাধ্যমেই ঐ বান্দা মুবারাক বা বরকত প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ বলেনঃ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ অর্থঃ যাত ও সত্ত্বাগতভাবে সেই আল্লাহ বরকতময় যিনি সারা বিশ্বের মালিক বা পালনকর্তা- সূরাহ গাফির আয়াত ৬৪।

অন্যত্র তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَتَبَارَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ج وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٨٥)

অর্থঃ বরকতময় সেই সত্ত্বা যিনি আসমান (আকাশ) যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর মালিক।

তাঁর নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তার জ্ঞান এবং তোমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে- সূরাহ্ যুখরুফ আয়াত ৮৫। লেখক বলেনঃ উপরোক্ত কথাগুলো অতি দীর্ঘ হলেও অত্যন্ত উপকারী, তাই আমি ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) হতে তা বর্ণনা করলাম। এর মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যা নিম্নরূপঃ

১। সকল প্রকার বরকত মহান রব্বুল আলামীনের পক্ষ হতেই আসে। যেমনঃ রিযিক, সাহায্য ও সুস্থতা আল্লাহর নিকট থেকেই আসে।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকটে বরকত চাওয়া বৈধ নয়, কেননা কেবল মাত্র তিনিই বরকত দিতে সক্ষম, অন্য কেউ নয়। যেমনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে তিনি বলেনঃ আমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী তথা মু'জিযাহকে বরকত মনে করতাম অথচ তোমরা তাকে আতঙ্ক মনে কর।

কোন এক সময় আমরা রাসূল (ﷺ) এর সাথে (সফরে) ছিলাম, তখন পানি সংকট দেখা দিলে রাসূল (ﷺ) বললেনঃ যে পানি টুকু আছে তা নিয়ে আসো। একটা পাত্রে তা নিয়ে আসা হলো। তিনি (ﷺ) ঐ পানির পাত্রে তাঁর পবিত্র হাত প্রবেশ করিয়ে বললেনঃ তোমরা বরকতময় পবিত্রতা অর্জন কর বা বরকতময় ওযু কর, আর বরকত কেবল মাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে। আমি স্পষ্টভাবে দেখি রাসূল (ﷺ) এর আঙ্গুলসমূহ থেকে পানি বের হচ্ছে- বুখারী ব্যাখা গ্রন্থ ফতহুল বারী ৬/৪৩৩।

যেহেতু সকল প্রকার বরকত মহান রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই আসে সেহেতু তা তিনি ভিন্ন অন্য কারও নিকটে চাওয়া তাঁর সাথে শিরক বা অংশীদার সাব্যস্ত করার অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকটে রিযিক্ব, উপকার চাওয়া এবং খারাপী বা ক্ষতি দমনের (প্রতিহত করার) প্রার্থনা করা শিরক । এতে কোন সন্দেহ নাই যে, বরকত কল্যাণকর বস্তু। আর সকল প্রকার কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, আলী বিন আবি তালিব (রাঃ) নবী কারীম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ﷺ) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন বলতেন:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ »

অর্থ: আমি একনিষ্ঠভাবে আমার চেহারাকে সেই সত্ত্বার প্রতি ধাবিত করছি যিনি আকাশ ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন, আর আমি শিরককারী বা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, কুরবাণী এবং জীবন-মৃত্যু সেই বিশ্ব প্রভুর জন্য যাঁর কোন অংশীদার নেই। আমাকে এরই আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

হে আল্লাহ! আপনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই। আপনি আমার রব বা পালন কর্তা আর আমি আপনার বান্দা, আমি স্বীয় আত্মার প্রতি যুলুম করেছি। আমি আমার পাপরাশি স্বীকার করি, সেহেতু আপনি আমার সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ব্যতীত অন্য কেউ গুণাহসমূহ ক্ষমা করার অধিকার রাখে না।

আমাকে সৎ চরিত্রসমূহ বা উত্তম ব্যবহারের পথ দেখান, আপনি ব্যতীত অন্য কেউ এ পথ দেখাতে পারে না। খারাপ বা গর্হিত চরিত্র হতে আমাকে দূরে রাখুন, এ ক্ষমতাও কেবল মাত্র আপনার। আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, যাবতীয় কল্যাণ আপনার হাতে, খারাপী বা অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নহে। (বরং আমার পক্ষ হতে)। আমরা আপনার কৃপায় এ পৃথিবীতে এসেছি এবং আপনার নিকটেই ফিরে যাব। আপনি বরকতময় ও সু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা চেয়ে আপনার প্রতিই ফিরে যাচ্ছি- সহীহ মুসলিম ইমাম নব্বীর ব্যাখ্যাসহ ৫৭/৬।

২। শরীয়তে যে সকল বস্তু, কথা ও কাজের মাধ্যমে বরকত অর্জনের কথা এসেছে তা কেবল বরকত লাভের কারণ বা মাধ্যম মাত্র। এ সকল কাজ-কর্ম যে স্বয়ং বরকত দান করে তা নয়। যেমন যে ঔষধের ও ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় তা স্বয়ং আরোগ্য দানকারী নয় বরং তা আরোগ্য লাভের কারণ বা মাধ্যম মাত্র। মূলতঃ আরোগ্য দানকারী হলেন: মহান রব্বুল আলামীন।

সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কোন ব্যক্তি কে বললেন: আমি কি তোমাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দু'য়া দিয়ে ঝাড় ফুঁক করতেন তা দিয়ে ঝাড় ফুঁক করব না?। ঐ ব্যক্তি বললেন: হ্যাঁ, তখন আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন-

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ فَقَالَ أَنَسٌ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ بَلَى قَالَ اللهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

অর্থ: হে মানব স্রষ্টা, আপনি আরোগ্য দান করুন। কেননা, আপনি ব্যতীত কেউ আরোগ্য দানকারী নেই। এমন আরোগ্য দান করুন যাতে করে অসুখের বিন্দু মাত্র অবশিষ্ট না থাকে। ফতহুল বারী ১০/৫। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

অর্থ: ছত্রাক হচ্ছে আসমানী খাদ্য, আর তার পানি হলো চোখের অসুখের আরোগ্যের কারণ বা মাধ্যম- সহীহুল বুখারী ১৩/৩৯৬।

অপর হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন:

إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنْ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ

অর্থ: কালো জিরা সাম ব্যতীত সকল রোগের আরোগ্য দানকারী। বর্ণনাকারী বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাম কি? তিনি ﷺ বললেন: সাম হলো মৃত্যু। সহীহুল বুখারী ১৭/৪৪৮।

তাই বলে ছত্রাক বা কালো জিরা কোনটির নিকটেই আরোগ্য প্রার্থনা করা যাবে না। বরং কেবল মাত্র মহান রব্বুল আলামীনের নিকটেই আরোগ্য চাইতে হবে।

ছত্রাক বা কালো জিরা উপকরণ ও মাধ্যম মাত্র যা কখনো আল্লাহর অনুমতিতে উপকারে আসে, কখনো আসে না। এমনিভাবে বরকতও আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। সে সকল বস্তুতে বরকত আছে বলে শরীয়তে উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ এই যে, উক্ত বস্তুগুলি বরকত লাভের মাধ্যম মাত্র। শর্তের অপূর্ণতা বা বাধা দানকারী বিষয়ের কারণে কোন কোন সময় তার প্রভাব কার্যকর নাও হতে পারে। যেমনটি শারঈ ও প্রাকৃতিক উপকরণ ও মাধ্যমের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। কারও প্রতি যে বরকতের সংযোজন বা সম্পর্ক করা হয় তা কেবল কোন বস্তুকে তার মাধ্যমের প্রতি সম্বন্ধকরণ মাত্র। যেমন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যুওয়াইরিয়াহ্ বিনতে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বলেন:

فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا

অর্থ: আমি এমন কোন মহিলাকে চিনিনা বা জানিনা যিনি যুওয়াইরিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে তাঁর ক্বওমের জন্য অধিক বড় বরকতের অধিকারিণী- মুসনাদে আহমাদ ২৬৪০৮।

অর্থাৎ তিনি হলেন: তাঁর ক্বওমের জন্য বরকতের কারণ, তিনি স্বয়ং বরকত দানকারিণী এমনটি নয়। আর সে ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

সাহাবাগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম যখন জানতে পারলেন যে, রাসূল ﷺ তাঁকে (যূওয়াইরিয়াহ্) রাযিয়াল্লাহু আনহা বিয়ে করেছেন, তখন তারা তাঁর ক্বওম বাণী মুস্ত

ালেকের একশত বন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, কারণ তারা হচ্ছেন রাসূলের ﷺ শ্বশুর বংশ।

অতএব এই বন্দী মুক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে একটা বড় বরকত। আর তার কারণ হলেন জুওয়াইরিয়াহ্ বিনতে হারিস (রাঃ)। এমনিভাবে প্রতিটি বরকতপূর্ণ জিনিসই কল্যাণ বৃদ্ধির কারণ এবং এ সকল বরকত দানকারী হলেন একমাত্র মহা পরাক্রমশালী মহান রব্বুল আলামীন।

৩। কোন জিনিসের মাধ্যমে বরকত অনুসন্ধান করা শরীয়ত সম্মত। সত্যিকারে কোন বস্তুতে বরকত আছে কি না বা কোন জিনিসের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা যাবে কি না তা নির্ধারণ করবে কেবল মাত্র শরয়ী দলীল। ধর্মীয় বিষয়াদির মূল ভিত্তি বা স্তম্ভ হচ্ছে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস। অপর দিকে দুনিয়াবী জিনিসগুলি তার বিপরীত। কেননা তা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়।

৪। কোন কিছুর মাধ্যমে কোন বিষয়ে বরকত অনুসন্ধান করা অধিকাংশ সময় উক্ত বিষয়ে বরকতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এমনটি নয় যে ঐ জিনিসের মাধ্যমে বরকত অর্জন হবেই। এজন্যই সাহাবগণ রাঃ এ ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকতেন। যেমন দেখা যায় যখন রাসূল ﷺ পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে বললেন: তোমরা বরকতময় ওযু সম্পন্ন কর। আর বরকত মূলত: আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে। রাসূলের ﷺ আঙ্গুলসমূহ দিয়ে পানি বের হচ্ছিল। সাহাবাগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) দ্রুত পানির নিকটে গেলেন এবং ঐ পানি দিয়ে নিজের পেট ভিজালেন এবং বেশী করে উক্ত পানি পান করলেন। কারণ রাসূল ﷺ বলেছিলেন: এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত- ফতহুল বারী ৪৩৩/১০।

অনুরূপ কর্ম পরিলক্ষিত হয় আবূ বকর (রাঃ) এর ক্ষেত্রেও। কেননা দেখা যায় তিনি শপথ করেছিলেন খানা খাবেন না, কিন্তু তাতে বরকত নাযিল হতে দেখে তা খেয়েছিলেন।

ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

ইমাম বুখারী রহঃ তাঁর সহীহুল বুখারীতে আব্দুর রহমান বিন আবূ বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসহাবে সুফফাহগণ ছিলেন দরিদ্র মানুষ। কোন একদিন রাসূল (ﷺ) বললেন: যার নিকটে দুই জনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয় একজনকে নিয়ে যায়। যার নিকটে চার

জনের খাবার আছে সে যেন পঞ্চম এবং ষষ্ঠ আরও দুই ব্যক্তিকে নিয়ে যায় (বা রাসূল (ﷺ) যেমনটি বলেছেন)।

আবু বকর (رضي الله عنه) তিন জনকে এবং রাসূল (ﷺ) দশ জনকে নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আবু বকরের (رضي الله عنه) বাড়ীতে তিন জন সদস্য ছিলেন। আব্দুর রহমান (رضي الله عنه) বলেন: তাঁরা হলেন: আমি ও আমার পিতা-মাতা। রাবী বা বর্ণনাকারী বলেন: আব্দুর রহমান (رضي الله عنه) আমার স্ত্রী এবং আমাদের দুজন খাদেমের কথা উল্লেখ করেছেন কি-না আমার মনে নেই। ও দিকে আবু বকর (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) এর নিকটে রাতের খাবার খেয়ে নেন। এরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতঃ এশার সালাত আদায় করেন। পরবর্তীতে রাসূল (ﷺ) রাতের খাবার শেষ হলে অনেক রাত্রে আবু বকর (رضي الله عنه) বাড়ী ফিরলেন।

তাঁর স্ত্রী তাকে বললেন: মেহমান পাঠিয়ে দিয়ে তুমি আবার দেরী করলে কেন? তিনি বললেন: তুমি কি তাদেরকে (মেহমানদেরকে) রাতের খাবার দাওনি? স্ত্রী বললেন: তাদেরকে খাবার দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তুমি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

আব্দুর রহমান (رضي الله عنه) বলেন: আমি গিয়ে চুপ করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন: 'এই বোকা, অতঃপর তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বকাবকি করে বললেন: তোমরা খাও, আমি কোন ক্রমেই এ খাবার খাব না।

আব্দুর রহমান (رضي الله عنه) বলেন: আল্লাহর শপথ! আমরা ঐ খাবার হতে যত লোকমাই খেয়েছি তার চেয়ে বেশী তার নিচ হতে বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষে দেখা গেল আমরা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পরও প্রথমে যা ছিল তার চেয়ে বেশী রয়ে গেছে। আবু বকর (رضي الله عنه) অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রীকে বললেন: হে পর্যবেক্ষণকারী গোত্রের ভগ্নি ব্যাপার কি? তিনি বললেন: আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আমি যে খাবার দিয়েছিলাম তার তিন গুণ এখানে রয়েই গেছে। অতঃপর আবু বকর (رضي الله عنه) সেখান থেকে খেলেন এবং বললেন: আমার শপথ ছিল শয়তানের ধোঁকা মাত্র। তিনি (رضي الله عنه) সেখান থেকে আরও খেলেন এবং রাসূলের (ﷺ) জন্য নিয়ে গেলেন, আল-হাদীস (ফতহুল বারী ৪৩৬/৬, ইসলামে নবূয়তের আলামত অধ্যায়)।

পূর্ববর্তী আলোচনা হতে আমরা একথা বলতে পারি যে, নেকী, কল্যাণ এবং মানুষ তার দুনিয়াবী ও ধর্মীয় ব্যাপারে যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন বোধ করে বরকতময় সত্ত্বা অথবা বরকতময় স্থানের মাধ্যমে তাতে বৃদ্ধি কামনা করে তাই আত্-তাবাররুক বা বরকত। তবে বরকত লাভের এ মাধ্যম শরীয়ত সম্মত এবং নিষ্পাপ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

বৈধ বা শরীয়তসম্মত পন্থায় বরকত অর্জন

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবী (ﷺ) এর স্বীয় যাত বা সত্তা ও নিদর্শনসমূহের দ্বারা বৈধ বরকত অর্জন করা

এ কথায় কোন সন্দেহ নাই যে, রাসূল (ﷺ)-এর স্বীয় সত্ত্বা বরকতপূর্ণ, আল্লাহ তাতে বিশেষ বরকত দান করেছেন এবং সাহাবাগণও ভালো করেই জানতেন। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় বুখারী শরীফে আয়িশা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: নিশ্চয় নবী (ﷺ) অসুখে সূরাহ্ নাস, ফালাক্ব ও অন্যান্য দু'য়ার মাধ্যমে স্বীয় শরীরে ফুঁ দিতেন। যখন তাঁর ﷺ অসুখ বেশী হয়ে গেল তখন আমি ঐ সকল দু'য়া দ্বারা ফুঁ দিতাম এবং তাঁর হাতের বরকতের কারণে তাঁর হাত দ্বারাই তাঁর শরীর মাসেহ্ করতাম- ফতহুল বারী ১৬৬/১০

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের (ﷺ) হাতের বরকতের খবর জানতেন বলেই তাঁর ﷺ হাত দ্বারাই তাঁর পবিত্র শরীর মাসাহ্ করতেন। আর রাসূল (ﷺ) আয়িশার রাযিয়াল্লাহু আনহা এ কাজকে সম্মতি দিয়েছেন। তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে এ কথা বলেননি যে, তোমার এবং আমার হাতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এতে বুঝা যায় এ বরকতটি কেবল মাত্র রাসূল (ﷺ) এর জন্য খাস।

আর এ বরকতটি আল্লাহর ইচ্ছায় ঐ বরকত অর্জনকারীর প্রতি স্থানান্তরিত হতে পারে যিনি জানেন যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে, যা কেবল মাত্র সৃষ্টির সেরা জীব মুহাম্মদ (ﷺ) এর জন্য খাস বা বিশেষিত। যেমন আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূল (ﷺ) যখন ফজরের সালাত আদায় শেষ করতেন তখন মদীনার খাদেমেরা পানির পাত্র নিয়ে তাঁর ﷺ নিকটে আসত। তিনি প্রতিটি পানির পাত্রে তাঁর পবিত্র হাত ডুবিয়ে দিতেন। কখনো কঠিন শীতের দিনে তাঁর নিকটে এ সকল পাত্র আনা হতো তখনো তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি নাপিতকে রাসূল (ﷺ) এর মাথা মুন্ডন করতে দেখলাম, তখন সাহাবাগণ রাঃ রাসূলের চুলগুলো মাটিতে পড়ার আগেই হাত দিয়ে ধরে নেয়ার জন্য তাঁর ﷺ চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে আছেন।

সহীহ মুসলিমে আনাস হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মে সুলাইম রাঃ যখন বাড়ীতে থাকতেন না তখন রাসূল এসে তাঁর বিছানায় ঘুমাতেন। (উম্মে সুলাইম রাঃ রাসূল ( ) এর মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)। আনাস বলেন: এমনি কোন একদিন রাসূল ( ) উম্মে সুলাইম রাঃ এর বাড়ীতে ঘুমিয়ে যান, তিনি আসলে তাঁকে বলা হলো, রাসূল ( ) আপনার বিছানায় শুয়ে আছেন। আনাস বলেন: গরমের কারণে রাসূলের ( ) শরীর হতে ঘাম ঝরে বিছানার উপরে থাকা চামড়ার একটা টুকরাকে সিক্ত করে ফেলে।

উম্মে সুলাই রাঃ এসে তাঁর ব্যক্তিগত বক্সটি খুলে ঐ ঘামগুলো নিংড়িয়ে বোতল বা শিশিতে ঢুকাতে লাগলেন। রাসূল ( ) আতঙ্কিত হয়ে জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মে সুলাই রাঃ তুমি কি করছো? তিনি বললেন: আমাদের বাচ্চাদের জন্য আপনার ঘামের বরকতগুলো জমা করছি। রাসূল ( ) বললেন: তুমি ঠিক করেছো। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, আমি এই ঘামগুলো আমার আতরের বা সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করব।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, সুমামাহ আনাস হতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সুলাইম রাঃ নবী ( ) এর জন্য একটা চাদর বিছাতেন, রাসূল ( ) তাঁর নিকট ঐ চাদরের উপর ক্বায়লূলাহ (দুপুরের খাওয়ার পর শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম) করতেন। আনাস বলেন: যখন নবী ( ) ঘুমিয়ে যেতেন তখন উম্মে সুলাইম রাঃ রাসূলের ( ) ঘাম ও চুল নিয়ে আতর বা সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে বোতলে রাখতেন- ফতহুল বারী ১/৫৯।

সুমামাহ বলেন: যখন আনাস এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন তিনি রাসূলের ( ) ঘাম ও চুলযুক্ত ঐ সুগন্ধি হতে কিছু তাঁর মৃত দেহে দিতে ওসিয়ত করেন, ফলে তাই করা হয়।

ইমাম যাহাবী রাঃ বলেন: আইয়ূব ইবনে সীরীন হতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে সীরীন তাকে বলেছেন, আমি উম্মে সুলাইম রাঃ এর নিকটে ঐ সুগন্ধি হতে কিছু অংশ পাওয়ার আবেদন করলে তিনি আমাকে সেখান হতে কিছু অংশ দিয়েছিলেন।

আইয়ূব বলেন: পরবর্তীতে আমি মুহাম্মাদ বিন সীরীনের নিকটে ঐ সুগন্ধির কিছু অংশ পাওয়ার জন্য আবেদন করলে তিনিও আমাকে তা থেকে অল্প দিয়ে ছিলেন, যা এখন আমার নিকটে সংরক্ষিত আছে।

আইয়ূব রাঃ বলেন: যখন মুহাম্মাদ বিন সীরীন মৃত্যু বরণ করেন তখন তাঁর মৃত দেহে ঐ সুগন্ধি দেয়া হয়েছিল- সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ২/৩০৭।

এ ব্যাপারে ইমাম মুসলিম রা: তাঁর সহীহ্ মুসলিম শরীফে সায়েব বিন ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন, সায়েব বিন ইয়াযীদ বলেন: আমার খালা আমাকে নিয়ে রাসূল (ﷺ) এর নিকটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমার বোনের ছেলের মাথা ব্যথা। তখন রাসূল (ﷺ) আমার মাথা মাসাহ করে দিয়ে আমার জন্য বরকতের দুআ করলেন। এরপর তিনি (ﷺ) ওযু করলেন, আমি তাঁর ওযুর পানি পান করে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালে রাসূলের (ﷺ) দুই ঘাড়ের মাঝে নবুয়তের সীল বা মোহর দেখতে পেলাম। তা ছিল গম্বুজ আকৃতির বোতাম সদৃশ।

ইমাম বুখারী রহঃ সহীহ্ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন হুদাইবিয়ার সন্ধির হাদীসে এসেছে: (.....অতঃপর উরওয়া (رضي الله عنه) নবী (ﷺ) এর সাহাবগণের দিকে গভীরভাবে দেখতে লাগলেন। তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ! ঐ সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখনই থুথু বা কফ ফেলেছেন তখনি সাহাবাগণ (رضي الله عنهم) তাঁদের হাতে তা লুফে নিয়ে মুখে ও শরীরে মালিশ করেছেন।

যখন রাসূল (ﷺ) তাঁদেরকে কোন নির্দেশ দিয়েছেন সাহাবাগণ (رضي الله عنهم) অতিদ্রুত তা পালন করেছেন। যখন তিনি ওযু করতেন তখন তাঁর (ﷺ) ওযুর পানি নেয়ার জন্য সবাই প্রতিযোগিতা করতেন। সাহাবাগণ (رضي الله عنهم) তাঁর সামনে কথা বললে নিচু স্বরে কথা বলতেন। রাসূল (ﷺ) এর সম্মানার্থে তাঁরা (رضي الله عنهم) তাঁর চোখে তীব্রভাবে দৃষ্টি রাখতেন না- সহীহ বুখারী ৩/১৮০ পৃষ্ঠা।

বুখারী শরীফে আবু মূসা আশয়া'রী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থানকালীন সময়ে আমি তাঁর নিকটে ছিলাম, বিলাল (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) এর সাথে ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন বেদুঈন রাসূল (ﷺ) এর নিকটে এসে বলল: আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা কি পূর্ণ করবেন না? তিনি (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। ঐ বেদুঈন বলল: আপনি আমাকে বার বার সুসংবাদ গ্রহণ করতেই বলেছেন! রাসূল (ﷺ) রাগত স্বরে আবূ মূসা আশ'য়ারী ও বিলাল (رضي الله عنهما) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: এ ব্যক্তি আমার সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমরা তা গ্রহণ কর।

তাঁরা উভয়ে বললেন: আমরা তা গ্রহণ করলাম। তিনি (ﷺ) একটা পানির পাত্র নিয়ে আসতে বললেন এবং তাতে হাত ও মুখ ধৌত করত:

সে পাত্রেই কুলি করলেন। অতঃপর বললেন: তোমরা এ পানি হতে পান কর, তা দ্বারা তোমাদের মুখ-মন্ডল ও গলা ভিজাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর, তাঁরা ﷺ পাত্র নিয়ে তাই করলেন।

পর্দার আড়াল হতে উম্মে সালামাহ্ রা: বললেন: তোমাদের মায়ের জন্য কিছু পানি রাখিও। ফলে তাঁরা ﷺ সেখান থেকে তাঁর জন্যও কিছু পানি রাখলেন- সহীহুল বুখারী ৫/১০৩।

ইমাম বুখারী (রহঃ) মালিক বিন ইসমাঈল হতে তিনি ইসরাঈল হতে তিনি উসমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহিব হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমার পরিবার আমাকে একটা পানির পাত্র দিয়ে রাসূল (ﷺ) এর স্ত্রী উম্মে সালামাহ রা: এর নিকটে পাঠালেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ইসরাঈল তাঁর মাথার সম্মুখের তিন আঙ্গুল পরিমাণ চুল ধরলেন (এ দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, পানির ঐ পাত্রটি খুব ছোট ছিল।) ঐ পাত্রে রাসূল (ﷺ) এর কিছু চুল ছিল। কোন ব্যক্তিকে যখন বদ নযর লাগত বা কোন ব্যক্তি কোন খারাপীর আশঙ্কা করতেন তখন তিনি একটা ছোট পানির পাত্র উম্মে সালামাহ্ রা: এর নিকটে পাঠিয়ে দিতেন। ইসরাঈল বলেন: আমি গভীর ভাবে নযর দিয়ে দেখতে পেলাম ঐ পাত্রে কিছু লাল চুল রয়েছে। সহীহুল বুখারী ৭/৫৭। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সনদে সাহল বিন সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: একজন মহিলা রাসূল (ﷺ) এর নিকটে একটা বুরদাহ নিয়ে আসলেন। সাহল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তোমরা কি বুরদাহ্ চিন? তখন লোকেরা বললেন: তা হচ্ছে, চাদর। সাহল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: তা হচ্ছে নকশাকৃত পাড়ওয়ালা চাদর। ঐ মহিলা এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনাকে পরানোর জন্য আমি এ চাদরটি নিয়ে এসেছি। কাপড়ের প্রয়োজন থাকায় রাসূল (ﷺ) চাদরখানা নিয়ে পরিধান করলেন।

সাহাবাগণের মধ্যে কোন একজন রাসূল (ﷺ) এর গায়ে চাদরখানা দেখে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এ চাদরখানা কতই না সুন্দর, আপনি আমাকে এ চাদরখানা দিয়ে দিন। রাসূল (ﷺ) হ্যাঁ, নাও বলে ঐ সাহাবীকে চাদরখানা দিয়ে দিলেন। রাসূল (ﷺ) যখন ঐ স্থান হতে উঠে চলে গেলেন তখন অন্যান্য সাহাবীগণ ঐ সাহাবীকে নিন্দা করত: বললেন: যখন তুমি দেখলে যে, চাদরখানার প্রয়োজন থাকায় রাসূল (ﷺ) তা গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁর নিকটে চাদরখানা চাওয়া তোমার ঠিক হয়নি। অথচ তুমি তো জানো তাঁর ﷺ নিকটে কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি না করেন না। তখন ঐ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: (যখন দেখলাম রাসূল

(ﷺ) তা পরিধান করেছেন তখন চাদরখানার বরকত নেয়ার জন্যই আমি রাসূল (ﷺ) এর নিকটে তা চেয়েছি। যাতে আমাকে ঐ কাপড়ে কাফন দেয়া হয়- সহীহুল বুখারী ৭/৮২।

পূর্বোল্লেখিত এবং আরও অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ﷺ) এর স্বীয় সত্ত্বা, তাঁর শরীর হতে পৃথককৃত চুল, ঘাম, পোষাক এবং তাঁর ব্যবহৃত পাত্রসমূহে আল্লাহ তা'য়ালা এমন বরকত দান করেছেন যার মাধ্যমে রোগ মুক্তি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বিভিন্ন উপকার আশা করা যায়। আর এ সকল কল্যাণের দাতা হলেন আকাশ-যমীনের পালন কর্তা মহান রব্বুল আলামীন। প্রখ্যাত জ্ঞানী ও গবেষক শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-বাণী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ অসীলা, তার প্রকার ও বিধানে, যে মত পোষণ করেছেন এ অসংখ্য প্রমাণাদি তার রদ বা খন্ডন করে।

সেখানে তিনি (রহঃ) লিখেছেন: (অসীলার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন। আর তা হলো: গযওয়ায়ে হুদাইবিআয় ও অন্যান্য সময়ে রাসূল (ﷺ) তাঁর চিহ্ন এবং স্মৃতিসমূহ দ্বারা সাহাবাগণের ﵃ বরকত লাভের বিষয়টিকে সমর্থন করে ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে, আর তা ছিল ঐ সময়ের জন্য খাস। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে: কুরাইশ সম্পদায়ের কাফিরদেরকে ভয় দেখানো, মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্ক দৃঢ় করা।

রাসূল (ﷺ) এর প্রতি সাহাবাগণের ভালবাসা, তাঁর খিদমতে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করা এবং তাঁর ﷺ সম্মানকে বড় করে দেখানোর বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এ কথা জানা আবশ্যক যে, রাসূল (ﷺ) গযওয়ায়ে হোদায়বিয়ার পরে খুব সূক্ষ্ম ও উপযুক্ত পন্থায় বা পদ্ধতিতে মুসলমানদেরকে এ বরকত অর্জনের পথ হতে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করত: তাদেরকে তা হতে ফিরিয়ে আনেন। তাদেরকে সৎ কর্মের পথ দেখান এবং বলেন যে, এটা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকটে ঐ বরকত অর্জনের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাকর। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে উপরোক্ত কথাই প্রমাণিত হয়:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ قَرَادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهِ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوْا : حُبُّ

اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ

অর্থ: আব্দুর রহমান বিন আবূ কুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) কোন একদিন ওযু করলে সাহাবাগণ (রাঃ) তাঁর ওযুর পানি দিয়ে শরীর মাসাহ করতে লাগলেন। নবী (ﷺ) তাঁদেরকে বললেন: কোন্ জিনিস তোমাদেরকে এ কাজের প্রতি উৎসাহ যোগাচ্ছে? তাঁর বললেন, আল্লাহ এবং রাসূলের (ﷺ) ভালোবাসা। তখন তিনি ﷺ বললেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) কে ভালোবাসতে চায়, অথবা আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসা পেতে চায় সে যেন সত্য কথা বলে। তার নিকটে আমানত রাখা হলে সে যেন তা যথাযথভাবে আদায় করে। প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে। (শুআবুল ঈমান ৩/১১০)

এ হাদীসের টীকায় তিনি (আলবানী রহঃ) লিখেছেন: হাদীসটি রাসূল (ﷺ) হতে বেশ কয়েকটি সনদে প্রমাণিত।

ইমাম ত্ববারানীর ম'জামাইন ও অন্যান্য গ্রন্থে এর স্ব-পক্ষে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম মুনযেরী (রহঃ) তারগীব গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আল-বানী (রহঃ) বলেন: আল-আহাদীসুস্ সহীহার ২৯৯৮ নাম্বারে আমি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছি। (আল-বানী রহঃ এর অসীলা, তার বিধান ও হুকুম গ্রন্থ ১৪৫ পৃষ্ঠা।

কিতবুল 'ইতিসামের টীকায় মুহাম্মাদ রাশীদ রেযা যে মত পোষণ করেছেন আমার উল্লেখিত প্রমাণাদি তারও খন্ডন করে। তিনি সেখানে বলেছেন: (হুদাইবিয়ার দিন ব্যতীত সাহাবাগণ (রাঃ) কর্তৃক রাসূল (ﷺ) এর ওযুর পানি ও থুথু দ্বারা বরকত অর্জনের কথা সু-প্রমাণিত নয়। 'ইতিসাম গ্রন্থের টীকা ২/১১।

রাশীদ রেযার বক্তব্য সঠিক না হওয়ার কারণ হচ্ছে: রাসূলের মাধ্যমে সাহাবাগণের বরকত অর্জনের বিষয়টি যে গযওয়ার ব্যাপারে দলীল হিসেবে এসেছে তার সাথেই শুধু খাস নয়। আবার এ বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে কোন সাহাবী থেকে বিরোধিতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আল্লামাহ আল-বানী (রহঃ) সাহেবের ঐ কথা আমাকে খুবই ভালো লেগেছে যেখানে তিনি বলেছেন: রাসূল (ﷺ) সাহাবাগণ (রাঃ)কে তাঁর মাধ্যমে বরকত অর্জন করা থেকে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান

করলেও এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে,আমরা রাসূলের (ﷺ) চিহ্ন ও স্মৃতিসমূহের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা বৈধ বলে বিশ্বাস করি এবং তা অস্বীকার করি না। যেমনটি হয়তো কেউ আমার আগের বক্তব্য হতে ধারণা করতে পারেন।

তবে এই বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে

১। আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয় শারঈ ঈমানঃ অতএব, যে ব্যক্তি মুসলিম নহে, ইসলামে বিশ্বাস করেনা, তার ক্ষেত্রে রাসূলের (ﷺ) এ সকল জিনিসের মাধ্যমে বরকত অর্জন করাতে কোন লাভ নেই। এর দ্বারা আল্লাহ তাকে কোন কল্যাণ দান করবেন না।

২। রাসূলের (ﷺ) মাধ্যমে বরকত অর্জনে আগ্রহী ব্যক্তি কে অবশ্যই তাঁর ﷺ ঐ সকল নিদর্শন, চিহ্ন এবং স্মৃতি সংগ্রহ করত: তা ব্যবহার করতে হবে। আর আমরা এটাও জানি যে রাসূল (ﷺ) এর কাপড়, চুল এবং ওযুর অতিরিক্ত পানি এখন বিদ্যমান নেই। এ সকল জিনিষের বিদ্যমানতার বিষয়টি কেউ নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত করতে পারবে না। যখন মূল বিষয়টি এরকমই তখন রাসূলের (ﷺ) নিদর্শনা

বলীর মাধ্যমে বরকত অর্জনের ব্যাপারটি বর্তমান যুগে কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। সেহেতু এ বিষয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

তবে রাসূল ﷺ এর স্বীয় যাত ও নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে বরকত অর্জনের দলিলাদি উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো যে, সাহাবাগণ رضي الله عنهم কেবল মাত্র রাসূল (ﷺ) এর মাধ্যমেই বরকত অর্জন করতেন। অন্য কারও যাত (সত্ত্বা), নির্দশন ও স্মৃতির মাধ্যমে তা করতেন না। যেমনটি নিষিদ্ধ পন্থায় বরকত অর্জনের অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ
কথা ও কার্যাদির মাধ্যমে বৈধ বরকত অর্জন

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এমন কিছু কথা, কাজ ও বরকতময় অবস্থা রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে কোন মুসলিম যদি সুন্নাতী পন্থায় কল্যাণ ও বরকত অনুসন্ধান করে তবে তার চেষ্টা ও নিয়ত অনুযায়ী তিনি কল্যাণ ও বরকত লাভে সক্ষম হবেন। যদি ঐ বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে বান্দার ও যে বরকত লাভে ইচ্ছুক তার মাঝে কোন শারঈ বাধা না থাকে।

যে সকল কথার মাধ্যমে বরকত অর্জন করা যায় তা নিম্নরূপ:

আল্লাহর যিকির বা স্মরণ ও তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা ব্যাপক কল্যাণ ও কোন বড় বিষয়ে বরকত অর্জন করতে পারে। বিষয়টি সকল মুসলিমেরই জানা। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রমাণ বহনকারী হাদীসটি ইমাম বুখারী রহঃ স্বীয় গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنْ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ

অর্থ: (আল্লাহর এক দল ফেরেশতা রয়েছেন যারা আল্লাহর যিকিরকারীদেরকে খোঁজার জন্য (তাই বলে আল্লাহু আল্লাহু বা হু হু

যিকিরকারীদের কে নয়, মূলত: ওরা বিদআতী কখনো শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়) রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।

যখন তাঁরা আল্লাহর যিকির বা স্মরণরত কোন দলকে পেয়ে যান তখন পরস্পরকে এ বলে ডাক দেন যে, তোমরা যাদেরকে খোঁজ করছো তারা এখানে, সেহেতু তোমরা তাদের দিকে আসো। রাসূল (ﷺ) বলেন: তখন ফেরেশতারা ঐ দলটিকে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদের পাখা দিয়ে ঘিরে ফেলেন। তিনি ﷺ বলেন: তখন তাদেরকে মহান রব্বুল আলামীন জিজ্ঞাসা করেন: (যদিও তিনি ঐ সকল লোক সম্পর্কে ফেরেশতাদের থেকেও বেশী অবগত আছেন) আমার বান্দারা কি বলছে? ফেরেশতাগণ বলেন: তারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, মহত্ব ঘোষনা করত: প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। তিনি ﷺ বলেন: তখন আল্লাহ্ বলবেন: তারা কি আমাকে দেখেছে? উত্তরে ফেরেশতাগণ বলেন: আল্লাহর শপথ তারা আপনাকে কখনো দেখেনি। তখন আল্লাহ্ বলবেন: যদি তারা আমাকে দেখতো তবে কি অবস্থা হতো? ফেরেশতাগণ বলেন: তারা আপনাকে দেখলে সর্বদা আপনার ইবাদাত, বড়ত্ব, মহত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যস্ত থাকত।

তখন আল্লাহ্ বলেন: তারা আমার নিকটে কি চায়? ফেরেশতাগণ বলেন: তারা আপনার নিকটে জান্নাত চায়। আল্লাহ্ বলেন: তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন: না দেখেনি, আল্লাহ্ বলেন: যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে কেমন হতো? ফেরেশতাগণ বলেন: তারা জান্নাত দেখলে তা অর্জনে সব চেয়ে বেশী আগ্রহী হয়ে ব্যাপক তৎপরতা দেখাতো। আল্লাহ বলেন: তারা কোন জিনিস থেকে আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলেন: তারা জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চায়। আল্লাহ্ বলেন: তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন: আল্লাহর শপথ! তারা তা কখনো দেখেনি। আল্লাহ্ বলেন: যদি তারা জাহান্নাম দেখতো তাহলে কি অবস্থা হতো? ফেরেশতাগণ বলেন: তাহলে তারা জাহান্নামকে খুবই ভয় করত এবং তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাত। তখন আল্লাহ্ বলেন: তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।

রাসূল (ﷺ) বলেন: তখন একজন ফেরেশতা বলেন: তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি রয়েছে যে যিকিরের জন্য বা ওয়াজ শুনার জন্য নয় বরং নিজের প্রয়োজনে এসেছে তখন আল্লাহ্ বলবেন: তারা তো ঐ সকল লোকদের

সাথেই বসে আছে সেহেতু যারা তাদের সাথে রয়েছে তারা দুর্ভাগা হবে না- সহীহুল বুখারী ২০/২৪; ফতহুল বারী ১১/১৭৭।

হে মুসলিম ভাই, যিকিরের (ইলমী মজলিসের) ব্যাপক বরকতের প্রতি খেয়াল করে দেখুন। এর দ্বারা পাপরাশির মোচন ও জান্নাত অত্যন্ত সহজেই অর্জিত হচ্ছে। শুধু ইলম অর্জনে আগত ব্যক্তিগণই উপরোক্ত দু'টি বস্তু লাভ করছেন না বরং যারা তাদের সাথে কেবল মাত্র বসার মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করবে তারাও তা অর্জন করবে। যেমনটি হাদীসের ভাষ্য হতে বুঝা যায়। যিকির বা ইলমী মজলিসের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ বা দিক হলো মহান রব্বুল আলামীনের মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআন তিলাওয়াতে এত ব্যাপক কল্যাণ ও বরকত রয়েছে যা মহান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গণনা করতে পারবে না।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে আবূ উমামাহ্ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: তোমরা বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত কর, কেননা ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তার তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশ করবে। তোমরা যাহরাওয়াইন তথা সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ও আলি ইমরান পাঠ কর, কেননা কিয়ামতের দিন এ সূরাদ্বয় তার পাঠকারীদের জন্য ছায়া দানকারী মেঘমালা হিসেবে আগমন করবে অথবা দলবদ্ধ দু'টি পাখির দল হিসেবে আগমন করে তার তিলাওয়াতকারীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। মুসলিম শরহে নব্বী ৬/৯০।

তোমরা সূরাহ্ বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত কর, কেননা তা ধারণ করা তথা তিলাওয়াত করা হচ্ছে বরকত আর তা ছেড়ে দেয়া বা না পড়া অনুতাপ ও ক্ষতি ছাড়া কিছুই নহে। আর বাতিলরা তা ধারণ করতে তথা নিয়মিত তিলাওয়াত করতে পারবে না। হাদীসের বর্ণনাকারী মুয়াবিয়া বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমার নিকটে এ খবর পৌঁছেছে যে, এ হাদীসে বাতিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যাদুকর। শরহে নব্বী ৬/৯০। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আরও বরকত হচ্ছে এর দ্বারা রোগ মুক্তি হয়। যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরাহ্ নাস, ফালাক্ব ও অন্যান্য দুয়ার মাধ্যমে সকল প্রকার অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাইতেন। আর যে সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূরাহ ফাতিহা পড়ে সাপে দংশিত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সেই কাজকে সমর্থন করেছিলেন। ফতহুল বারী ১০/১৬৫-১৬৯।

এমনিভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দুয়াসমূহেরও বরকত রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ اللهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

অর্থাৎ রাসূল (ﷺ) তাঁর পরিবারের কোন সদস্যকে ঝাড়-ফুঁক করতে গিয়ে নিজের ডান হাত দিয়ে ঐ ব্যক্তির অসুস্থ স্থান মাসাহ্ করছিলেন এবং বলছিলেন:

اللهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

অর্থ: হে মানুষের পালনকর্তা, আপনি সকল অসুবিধা দূর করে দিন। আপনি তাকে শিফা দিন বা রোগ মুক্ত করুন। কেননা কেবল মাত্র আপনিই আরোগ্য করতে পারেন, অন্য কেউ তা পারে না। তাকে আপনি এমন আরোগ্য দান করুন যাতে সামান্য পরিমাণও অসুবিধা না থাকে- ফতহুল বারী ১০/১৭৬।

অতএব, বুঝা গেল আল্লাহর যিকির (স্মরণ), পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং নবী (ﷺ) হতে সু-প্রমাণিত দুয়াসমূহে ব্যাপক কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

অর্থ: আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ বলেন: যিকিরকারী ও যিকির না কারীর দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়- সহীহুল বুখারী ২০/২৩, ফতহুল বারী ১১/১৭৭। (উল্লেখ্য যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শারঈ সুন্নাতি যিকির, সূফীদের বা বিদআতীদের মতো যিকির নয়)।

চিন্তা করে দেখুন, জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মাঝে কোন দিক দিয়ে মিল আছে কি? উপরোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করতে পারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।

আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তার মূল্যবান গ্রন্থ আল-ওয়াবিলুসসইব মিনাল কালিমিত ত্বইয়িবে লিখেছেন: যিকির বা দুয়ার একশটিরও বেশী উপকারিতা রয়েছে, তার মধ্যে তিনি প্রায় সত্তরাধিক উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখিত গ্রন্থ ৫২ পৃষ্ঠা।

কর্ম বা কাজের মাধ্যমে বরকত অর্জন

এমন কিছু কর্ম রয়েছে যদি কোন মুসলিম বান্দা রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্যের জন্য তা নিয়মিত পালন করে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি বড় ধরনের বরকত অর্জনে সক্ষম হবেন। যেমন: যিকিরের মজলিসে একত্রিত হওয়া, কোন ইলমী মজলিসে যোগ দেয়া এবং অনুরূপ কার্যাবলী। কোন বান্দা একাকী নির্দিষ্ট দুয়াসমূহ পাঠ করাতে এ বরকত অর্জনে সক্ষম নহে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো: রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কিরামগণের দিক নির্দেশনা। এ কাজের ফযীলত একটু পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে- ফাতহুল বারী ১/১৭৭।

বরকতময় কর্মসমূহের মধ্যে রয়েছে: জিহাদের ময়দানে অগ্রগামী যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে শাহাদাত অর্জন করা। এতে এমন বড় ধরনের বরকত রয়েছে যা ঈমান, রিসালাত ও নবূয়ত ব্যতীত অন্য কোন কর্মে নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يَغْفِرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةِ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنْ الْحُوْرِ [الْعِيْنِ] وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ.

অর্থ: মিক্বদাম বিন মা'দীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহর নিকটে শহীদের জন্য ছয়টি পুরস্কার রয়েছে: প্রথমেই তাঁর সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এরপর তাঁর ছয়টি পুরস্কার হলো:

১। শহীদ ব্যক্তি জান্নাতে তাঁর অবস্থান স্থল দেখতে পান।

২। কবরের শাস্তি হতে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।

৩। বড় ধরনের ভয়-ভীতি এবং আশংকা হতে তাঁকে নিরাপত্তা দেয়া হয়।

৪। তাঁর মাথায় সহনশীলতা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার তাজ বা মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে। যার একটা মণি বা মুক্তার খন্ড দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সকল বস্তু হতে উত্তম।

৫। বাহাত্তর জন জান্নাতী হুরের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে এবং

৬। তাঁর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সত্তর ব্যক্তির জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। সহীহ তিরমিযী ২/১৩২, তিরমিযী হাদীস নং ১৭২৮।

বরকতময় অবস্থা

বরকতময় অবস্থার মধ্যে রয়েছে একত্রে এবং একই থালার ডান দিক হতে খাওয়া, আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়া, পরিমাণ মতো খাদ্য গ্রহণ করা। হাদীসে এসেছে রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তোমরা একত্রে খানা খাও এবং খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের খাদ্যে বরকত দান করবেন। মুসনাদে আহমাদ ৩/৫০১, সহীহ আবু দাউদ ২/৭১৭, আবু দাউদ হাদীস নং ৩৭৬৪, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৮৬, আল্লামা আল-বানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন: বরকত খাবারের মধ্যখানে নাযিল হয়, তাই তোমরা থালার পার্শ্ব হতে খাও এবং মধ্যখান হতে খেয়োনা। মুসনাদে আহমাদ ১/২৭০, সহীহ আবূ দাউদ ২/৭১৯, তবে আবূ দাউদের শব্দগুলো হলো: তোমাদের কেউ যখন খানা খায় তখন যেন উপর হতে (মধ্য খান হতে) না খেয়ে নিচ তথা এক পাশ থেকে খায়, কেননা খাবারের উপরের অংশে বরকত নাযিল হয়। আবূ দাউদ হাদীস নং ৩৭৭২, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৭৭।

রাসূল (ﷺ) অপর হাদীসে বলেন: তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন আঙ্গুল চেটে খায়, কেননা সে জানেনা খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। মুসনাদে আহমাদ ২/৩৪১।

রাসূল (ﷺ) বলেন: তোমরা ওজন করে পরিমাণ মতো খাবার গ্রহণ কর। তাহলে তাতে মহান রব্বুল আলামীন বরকত দান করবেন। সহীহুল বুখারী ৩/২২, কিতাবুল বুয়ূ বা ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়।

মোট কথা, প্রত্যেক ঐ কথা ও কাজ যে বিষয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) আদেশ দিয়েছেন, তা যদি কোন বান্দা আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূল (ﷺ) কে সত্যায়ন সহকারে আল্লাহর বিধান পালনার্থে রাসূল (ﷺ) এর অনুসরণের জন্য করে থাকেন তবে এতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি অতিসত্তর উভয় জগতে বড় ধরনের বরকত অর্জন করবেন। এটাই হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমানের বাস্তবরূপ। কেননা ঈমান হচ্ছে অন্তর ও মুখের কথা এবং অন্তর ও মুখে যা উচ্চারিত বা বলা হয় তার সঠিক বাস্তবায়ন। যেমনটি আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাত থেকে, তাঁদের নিকটে এসবের সংমিশ্রনেই হচ্ছে ঈমান। সেহেতু বরকত প্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছেন তিনিই যাকে আল্লাহ পরিপূর্ণ ঈমান দান করেছেন- শরহুত্তাহাবিয়াহ্ ৩৭ পৃষ্ঠা এবং কিতাবুস্সালাত লি ইবনে ক্বাইয়িম (রহঃ) ৫৩ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্থানসমূহের মাধ্যমে বৈধ পন্থায় বরকত অর্জন করা

পৃথিবীর নির্দিষ্ট ভূখন্ডে মহান রব্বুল আলামীন ব্যাপক কল্যাণ দান করেছেন। যদি কোন মুসলিম বান্দা ইখলাস বা শির্কমুক্তভাবে রাসূলের (ﷺ) দেয়া পদ্ধতিতে ঐ সকল স্থানে এই বরকত অনুসন্ধান করে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি তা পেতে পারেন। এ সকল স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে মসজিদসমূহ:

রাসূল (ﷺ) বলেন: (আল্লাহর নিকটে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ আর সবচেয়ে খারাপ বা অপছন্দনীয় স্থান হচ্ছে বাজার)। মসজিদের মাটি বা দেয়াল স্পর্শের মাধ্যমে বরকত অর্জন বৈধ নয়। কেননা বরকত অর্জন হচ্ছে ইবাদাত।

আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলের (ﷺ) অনুসরণ করা অন্যতম শর্ত। মসজিদে বরকত অর্জনের ধরণ বা পদ্ধতি হলো: মসজিদে ইতিক্বাফ করা, তাতে নামাজের জন্য অপেক্ষা করা, জামাতে নামাজ আদায় করা, মসজিদে যিকির ও ইলমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া এবং অনুরূপ শরীয়ত সম্মত বিষয়সমূহ।

যা শরীয়ত সম্মত নয় তথা যার দলীল নেই সে সকল কর্ম মসজিদে করলেও তাতে বরকত হবে না, বরং দলীল না থাকায় তা বিদআত বলে গণ্য হবে।

যে সকল মসজিদের বিশেষত্ব ও অধিক বরকত রয়েছে সেগুলোঃ মাসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ), মাসজিদে নব্বী, মাসজিদে আক্বসা (বাইতুল মুক্বাদ্দাস) এবং মাসজিদে ক্বুবা। কেননা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

অর্থ: আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেন: আমার এ মাসজিদের এক ওয়াক্ত সালাত মাসজিদে হারাম (কা'বা শরীফ) ব্যতীত অন্য যে কোন মাসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত সালাতের চেয়ে উত্তম। সহীহুল বুখারী ৪/৩৭৭।

وَالصَّلَاةُ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيْ هَذَا

অর্থ: মুসনাদে আহমাদে রয়েছে মাসজিদে হারামের (কা'বা শরীফের) এক ওয়াক্ত সালাত মাসজিদে নব্বীর একশত ওয়াক্ত সালাতের চেয়েও উত্তম। ২৬/৪২।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

অর্থ: আবূ হুরাইরাহ রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন তিনি ﷺ বলেন: অধিক সওয়াবের আশায় তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের দিকে সফর করা জায়িয নয়। মাসজিদ তিনটি হলো: মাসজিদে হারাম বা কা'বা শরীফ, রাসূল (ﷺ) এর মাসজিদ তথা মাসজিদে নব্বী এবং মাসজিদে আক্বসা।

সহীহুল বুখারী ৪/৩৭৬। শরহে মুসলিম ইমাম নব্বী ৯/১৬৮।

قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : - قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيْهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ) . قال الشيخ الألباني : صحيح

অর্থ: সাহল বিন হুনাইফ বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে বা বাসায় ওযু করে মাসজিদে কুবাতে এসে এক ওয়াক্ত অপর বর্ণনাতে এসেছে দুই রাকাত সালাত আদায় করল তার জন্য একটি উমরার সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ্ ৪/৩৩১, মুসনাদে আহমদ ৩/৪৮৭, নাসায়ী ২/৩৭।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ مَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ مَا يَفْعَلُهُ

অর্থ: আব্দুল্লাহ্ বিন উমার হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) প্রতি শনিবার বাহনে চড়ে বা পায়ে হেঁটে মাসজিদে কুবাতে আসতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার ও এমনটি করতেন।

সহীহুল বুখারী ৪/৩৮১। মুসলিম শরহে নব্বী ৯/১৭০।

বরকতময় স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে: মক্কা, মদীনাহ্ এবং শাম বা সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তীন ও লেবানন। কেননা রাসূল (ﷺ) মক্কা সম্পর্কে বলেন:

وَاللهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ وَاللهِ لَوْلَا أَنِّيْ أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ.

অর্থ: আল্লাহর শপথ! হে মক্কা, নিশ্চয় তুমি আমার নিকটে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সর্ব শ্রেষ্ঠ, কল্যাণময় এবং প্রিয় ভূমি। যদি তোমার হতে আমাকে বের করে দেয়া না হতো তবে আমি বের হতাম না।

সুনানে ইবনে মাজাহ্ ৯/২৫৩।

রাসূল (ﷺ) বলেন: ইবরাহীম (عليه السلام) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করতঃ মক্কার অধিবাসীদের জন্য দুয়া করেছেন। ইবরাহীম (عليه السلام) যেমন মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন অনুরূপ আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি।

ইবরাহীম (عليه السلام) মক্কাবাসীদের জন্য যে পরিমাণ বরকতের দু'য়া করেছেন, আমি মদীনাবাসীর সা'ও মুদে তার দ্বিগুণ পরিমাণ বরকত দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকটে দু'য়া করেছি। এক সা' সমান প্রায় আড়াই কেজি, এক মুদ সমান তিন পোয়া। সহীহ্ মুসলিম শরহে ইমাম নব্বী ৯/১৩৪।

রাসূল (ﷺ) বলেন: আমি মাদীনার দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানের বৃক্ষ কাটা এবং এ দুয়ের মাঝে শিকার করা ও পশুকে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করেছি। মাদীনাহ্ মানুষের জন্য কল্যাণকর ভূমি যদি তারা জানতো। মাদীনাকে অপছন্দ করতঃ কেউ যদি তা পরিত্যাগ করে তবে আল্লাহ্ তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে মাদীনায় স্থান করে দিবেন। যারা অভাব-অনটন ও অসুখ-বিসুখ সত্ত্বেও ধৈর্য্য ধারণ করে মাদীনাতে অবস্থান করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হবো। আগের কিতাব দ্রষ্টব্য।

রাসূল (ﷺ) বলেন: মাদীনার প্রতিটি প্রবেশ দ্বারে ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন, মাদীনায় মহামারী এবং দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। আগের কিতাব দ্রষ্টব্য।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি মাদীনার অধিবাসীদের কোন ক্ষতি করতে চাইবে আল্লাহ তাকে পানিতে লবণ মিশানোর ন্যায় ধ্বংস করে দিবেন। শরহে সহীহ্ মুসলিম ইমাম নব্বী ৯/১৫৭।

তিনি (ﷺ) আরো বলেন যে, শাম-সিরিয়া ও তার অধিবাসীদের জন্য সু-সংবাদ এবং আশীর্বাদ। সাহাবাগণ (رضي الله عنهم) বললেন: আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এটা কি জন্য? তিনি (ﷺ) বললেন: এ জন্য যে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের পাখাসমূহ সিরিয়ার উপর

বিছিয়ে রেখেছেন। মুসনাদে আহমাদ ৫/১৮৫, মুসতাদরাকে হাকিম ২/২২৯, সহীহ্ জামি উস্‌সাগীর ২/৫৫।

আল্লাহর ﷻ নিম্নোক্ত বাণী থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়:

سُبْحَانَ الَّذِيٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (١)

অর্থ: পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আক্বসা পর্যন্ত -যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। সূরাহ্ আল-ইসরা আয়াত নং- ১।

অতএব, যে ব্যক্তি মহান রব্বুল আলামীনের বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে মক্কা, মাদীনাহ্ ও সিরিয়ায় অবস্থান করবেন, তিনি অবশ্যই ব্যাপক কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবেন। হতে পারে সে বরকত অর্জন রিযিক্ব বৃদ্ধি, বিপদাপদ দূর করা বা তা থেকে হেফাযতে থাকা।

তবে বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে বান্দা যদি বাড়াবাড়ি করে যেমন: ঐ সকল স্থানের মাটি, পাথর ও বৃক্ষাদি মাসাহ্ বা স্পর্শ করতঃ বরকত অর্জনের চেষ্টা করে, ঐ সকল স্থানের মাটি পানিতে রেখে বা অন্য কোন শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় বরকত অর্জন করে তাহলে সে বান্দা সওয়াব ও বরকত অর্জনের পরিবর্তে গোনাহ্গার হবে। কেননা সে বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যা রাসূল (ﷺ) বা তাঁর সাহাবীগণ অবলম্বন করেননি। অত্র বইয়ের শেষভাগে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

অনুরূপভাবে পবিত্র স্থানসমূহ যেমন: আরাফাহ্, মুযদালিফাহ এবং মিনা। সন্দেহ নেই যে, এ সকল স্থানে মানুষের উপর ব্যাপক কল্যাণ অবতীর্ণ হয়, সেহেতু তা বরকতপূর্ণ স্থানসমূহের অন্তর্গত। রাসূল (ﷺ) এর অনুসরণের বরকতে শরীয়ত সম্মত সময়ে এ সকল স্থানে অবস্থান করলে আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা, জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং বড় ধরনের সওয়াব অর্জন হয়।

অপর দিকে কেউ যদি আরাফার দিবস ব্যতীত অন্য দিনে সেখানে গিয়ে অবস্থান করে তবে তার পক্ষে এ বরকত অর্জন সম্ভব হবে না। অর্থাৎ, এ সব স্থান সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সময় বা যুগের মাধ্যমে বৈধ পদ্ধতিতে বরকত অর্জন করা

কিছু বরকতময় সময় রয়েছে যাতে আল্লাহ্ ﷻ বিশেষভাবে ব্যাপক কল্যাণ ও বরকত দান করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি ঐ সময়গুলোতে যথাসাধ্য ভালো কাজ করে, ঐ সময়ে শরীয়তসম্মত কার্যাদি সম্পাদন করতঃ বরকত অনুসন্ধান করে, সে ব্যক্তি এমন বড় ধরনের বরকত অর্জন সক্ষম হবে যা আল্লাহই ভালো জানেন। ঐ সময়গুলো হচ্ছে: রমযান মাস, লাইলাতুল কদর, প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ, জুমু'আর দিবস, সোম ও বৃহস্পতিবার, হারাম মাসসমূহ এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।

যেমন: রাসূল (ﷺ) রমযান মাস সম্পর্কে বলেন: তোমাদের নিকটে পবিত্র রমযান মাস আগমন করেছে, এ মাসের রোযা বা সিয়ামকে আল্লাহ্ তোমাদের উপর ফরয বা আবশ্যক করেছেন। এতে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এ মাসে এমন একটি রজনী রয়েছে যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রজনীর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে সে ব্যক্তি ব্যাপক কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে। মুসনাদে আহমাদ ২/২৩০।

রমযানের বরকতে এ মাসে তৌফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে সকল কল্যাণ লাভ করে সেগুলো হচ্ছে: রমযানের ফযীলত বা মর্যাদা, পাপরাশির মোচন, মুমিন ব্যক্তির রিযিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণগত ব্যাপক উপকারিতা, সর্বোপরি মহান রব্বুল 'আলামীনের নিকট মহা প্রতিদান। এ সব কিছুই অর্জিত হয় পবিত্র রমযান মাসের বরকতময় সময়ের বদৌলতে।

লাইলাতুল কদরের বিষয় বা ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাকর। যেমন: আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

১। আমি একে (আলকুরআনকে) নাযিল করেছি মহিমান্বিত রজনীতে।

২। মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

৩। মহিমান্বিত রজনী (লাইলাতুল ক্বদর) হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৪। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল ﷺ) অবতীর্ণ হন তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে, এবং

৫। এটা নিরাপত্তা ও শান্তি যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সূরাহ্ আল-ক্বদর আয়াত ১-৫।

আল্লাহ ﷻ অন্যত্রে বলেন:

(إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣)

অর্থ: নিশ্চয় আমি তা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি বরকতময় রজনীতে, অবশ্যই আমি ভীতি প্রদর্শক ও সতর্ককারী।

সূরাহ্ আদ্দুখান আয়াত নং ২।

এ রজনীর ব্যাপক কল্যাণের জন্যই রাসূল (ﷺ) তা অনুসন্ধান করতে বলেছেন। তিনি ﷺ বলেন: তোমরা রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান কর।

ফতহুল বারী ৪/২২৬।

বরকতময় সময়ের মধ্যে রয়েছে: যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। যেমন রাসূল (ﷺ) বলেছেন: (যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদাতের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ ও মর্যাদাকর কোন ইবাদাত নেই। সাহাবাগণ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন: জিহাদ করলেও কি সে মর্যাদা পাওয়া যাবে না হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ? তিনি বললেন: জিহাদ করলেও অনুরূপ ফযীলত পাওয়া যাবে না।

তবে কোন ব্যক্তি যদি তার জান-মাল সহকারে জিহাদের ময়দানে গিয়ে কোন কিছু নিয়ে ফিরে না আসেন তবে তিনি এ ফযীলত বা মর্যাদা অর্জন করবেন। (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করেন এবং তাঁর আসবাব পত্রও খোয়া যায়)। ফতহুল বারী ২/৩৮৩।

আরাফার দিবসে হাজিদের উপরে যে ব্যাপক অনুগ্রহ ও দুয়া করা হয় তা তো সবার জানা কথা। আরাফার ময়দানে অবস্থানরত হাজীদেরকে নিয়ে আল্লাহ ﷻ ফেরেশতাদের সাথে গর্ব ও অহংকার করে বলেন: দেখো, আমার এ বান্দারা কেবল মাত্র ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অত্র স্থানে একত্রিত হয়েছে। হাজী ব্যতীত যে সকল ব্যক্তিরা এ দিবসে সিয়াম বা রোযা রাখবে তারা এমন বরকত অর্জন করবে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আর তা হচ্ছে: দু'বছরের পাপরাশি মোচন।

রাসূল (ﷺ) বলেন: রমযান মাস পুরা এবং অন্য মাসগুলোতে তিনটি করে সিয়াম পালন করলে সারা বছর সিয়াম সাধনার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আরাফার দিবসে (হাজী ব্যতীত) রোযা রাখবে আল্লাহ ﷻ তার এক বছর পূর্বের ও এক বছর পরের গুণাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আশুরার দিবসে রোযা রাখলে আল্লাহ্ ﷻ পূর্ববর্তী এক বছরের গুণাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেন। শরহে মুসলিম ইমাম নব্বী (রহঃ) ৮/৫০।

* রাসূল (ﷺ) বলেন: (সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আর দিন হলো সর্বোত্তম। এ দিনে আদম ؑ কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁকে ؑ জান্নাতে প্রবেশ ও জান্নাত হতে বের করা হয়েছে। জুমু'আর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে- শরহে মুসলিম ইমাম নব্বী (রহঃ), ৬/১৪১।

জুমু'আর দিবস সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) আরো বলেন যে, (জুমু'আর দিবসে এমন একটি সময় রয়েছে কোন মুসলিম বান্দা ঐ সময়ে সালাত আদায় করে আল্লাহর নিকটে যা চাইবে তিনি ﷻ তাকে তাই দান করবেন। রাসূল (ﷺ) তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে দেখালেন সময়টা খুব কম- ফতহুল বারী ২/৩৪৫।

রাসূল (ﷺ) বলেন: (প্রতি সোম ও বৃহস্পতি বার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক ব অংশীদার সাব্যস্ত করেনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয় ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে শত্রুতা বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ﷻ ফেরেশতাদেরকে বলেন: (এদের দু'জনকে একটু সময় দাও, যাতে তারা মীমাংসা করে নেয় এভাবে তিনবার বলা হয়)-

শরহে মুসলিম ইমাম নব্বী (রহঃ) ১৬/১২২।

রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ হচ্ছে দুনিয়ার আকাশে মহান রব্বুল আলামীনের অবতরণের সময়। যখন আল্লাহ্ ﷻ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন তখন তাঁকে আহবানকারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের জন্য বড় ধরনের বরকত অবতীর্ণ হয়।

যেমন রাসূল (ﷺ) বলেছেন: (প্রত্যেক রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে মহান রব্বুল আলামীন দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেন: কে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে আমার নিকটে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দান করব, কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব)। সহীহুল বুখারী ৮/১৯৭।

লেখক বলেন: মুসলিম বান্দার জন্য তার পাপরাশি মোচনের চেয়ে বড় কোন বরকত রয়েছে কি? আল্লাহ্ ﷻ আমাদেরকে ঐ সকল লোকদের অন্ত র্ভুক্ত করুন যাদের সকল গুণাহ্সমূহ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, সকল সময়ের মর্যাদা সমান নয়। কিছু সময় এমন রয়েছে যাতে মহান রব্বুল আলামীন বিশেষ ভাবে কল্যাণ, ফযীলত এবং ব্যাপক বরকত দান করেছেন। ঐ সকল সময়ে আল্লাহ্ ﷻ অথবা রাসূলগণের সর্দার মুহাম্মাদ (ﷺ) এর দেখানো শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বরকত অনুসন্ধান করতে হবে। তবে ঐ সময়গুলোর বরকত পাওয়া যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি শরীয়তসম্মত পদ্ধতি ছাড়া এ সকল বরকতময় সময়ের বরকত অর্জন করতে চায় তবে সে কখনো সে বরকত বা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। কেননা বরকত অনুসন্ধান করা হচ্ছে ইবাদাত, আর ইবাদাতের রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত যেমন আগে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

যে ব্যক্তি ইবাদাতের শর্ত ছাড়া ইবাদাত করবে সে ঐ বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ'আত করার কারণে সওয়াব ও বরকত অর্জনের পরিবর্তে গোনাহগার হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এরূপ করা থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খাদ্য জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে শরঈ পন্থায় বরকত অর্জন ও তার বিধান

যে সকল খাবারে বরকত পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে: যাইতুন বৃক্ষ হতে নিষ্কাশিত যাইতুন তৈল। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন:

يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا

يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

অর্থ: তাতে পূতঃপবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন

আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। সূরাহ্ নূর আয়াত ৩৫। রাসূল (ﷺ) বলেন:

عَنْ أَبِيْ أَسِيْدٍ ﷺ : عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : كُلُوْا الزَّيْتَ وَ ادَّهِنُوْا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

অর্থ: আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তোমরা যাইতুনের তৈল খাও এবং শরীরে ব্যবহার কর, কেননা তা বরকতময় বৃক্ষ হতে নির্যাসিত হয়েছে-

মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৯৭, মুসতাদরাকে হাকিম ২/৩৯৮,সনদ সহীহ।

অপর হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন:

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : (ائْتَدِمُوْا بِالزَّيْتِ وادَّهِنُوْا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ)

অর্থ: উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেছেন: তোমরা তরকারিতে এবং শরীরে যাইতুনের তৈল ব্যবহার কর, কেননা তা বরকতময় বৃক্ষ হতে নির্যাসিত হয়েছে। সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ শাইখ আল-বানী (রহঃ) ২/২৩৩, ইবনে মাজাহ্ ১০/৫৯।

বরকতময় খাদ্যের মধ্যে রয়েছে: দুধ, হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِاللَّبَنِ قَالَ كَمْ فِي الْبَيْتِ بَرَكَةً أَوْ بَرَكَتَيْنِ

অর্থ: আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রাসূল (ﷺ) এর নিকটে দুধ নিয়ে আসা হতো তখন তিনি ﷺ বলতেন : এ বাড়ীতে কতইনা বরকত রয়েছে- মুসনাদে আহমাদ ৫১/১২৮।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ . وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ . فَإِنِّيْ لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِيُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ) . قال الشيخ الألباني : حسن

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) বলেছেন: (যাকে আল্লাহ কোন খাদ্য খাওয়ান সে যেন বলে: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি, অরযুক্বনা খাইরাম মিনহু। (হে আল্লাহ্ এ খাদ্যে

আমাদেরকে বরকত দাও এবং তা হতে উত্তম রিযিক্ব আমাদেরকে দান কর। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ দুধ পান করান সে যেন বলে: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়াযিদনা মিনহু। (হে আল্লাহ্ এ খাদ্যে আমাদেরকে বরকত দাও এবং এ প্রকার খাদ্য আমাদেরকে আরও বেশী পরিমাণ দান কর- সুনানে ইবনে মাজাহ্ ১০/৬৩। সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ লিল আলবানী (রহঃ) ২/২৩৩।

ঔষধের ক্ষেত্রে যে সকল খাদ্য বস্তুতে ব্যাপক বরকত নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে: কালো জিরা, আজওয়া খেজুর এবং ছত্রাক। রাসূল (ﷺ) বলেন: কালো জিরাতে বিষে আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকল রোগের মুক্তি রয়েছে- সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ ২/২৫৪। ইবনে মাজাহ্ হাদীস নং ৩৪২৮।

রাসূল (ﷺ) আরও বলেন: ছত্রাক হচ্ছে আসমানী খাবার, তার পানি চোখের অসুখে আরোগ্য দানকারী। আজওয়া খেজুর হচ্ছে জান্নাতীদের খাবার, তাতে রয়েছে পাগলামি অসুখ হতে মুক্তির গ্যারান্টি-

সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ ২/২৫৪, ইবনে মাজাহ্ হাদীস নং ৩৪৫৩ হাদীস।

রাসূল (ﷺ) বলেন: যে ব্যক্তি সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে ঐ দিন কোন যাদু ও বিষ ক্রিয়া তার ক্ষতি করতে পারবে না।

ফতহুল বারী ১০/২০৪।

বরকতময় খাবারের মধ্যে রয়েছে: মধু, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা এক ব্যক্তি এসে রাসূল (ﷺ) কে বললেন: আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে বা পেটে গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। তিনি ﷺ বললেন: তাকে মধু পান করাও। তাকে মধু পান করিয়ে ঐ ব্যক্তি এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমি আমার ভাইকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু তাতে তার পেটের অসুখ আরও বেড়ে গেছে! তিনি ﷺ তাকে আবার মধু পান করাতে বললেন। ঐ ব্যক্তি তার ভাইকে মধু পান করিয়ে আবার রাসূল (ﷺ) এর নিকটে এসে বললেন: আমি তাকে আবার মধু পান করিয়েছি, পেটের অসুখ বেড়েছে, কমেনি। রাসূল (ﷺ)তখন বললেন: আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছে। তাকে আবার মধু পান করাও। ফলে ঐ ব্যক্তি আবার তার ভাইকে মধু পান করালে সে আরোগ্য লাভ করে- ফতহুল বারী ১০/১১৯।

সম্ভবত: রাসূল (ﷺ) তাঁর কথা 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন' দ্বারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীকেই বুঝাতে চেয়েছেন:

يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

অর্থ: মৌমাছির পেট হতে বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন রংয়ের পানীয় বের হয়, তাতে মানুষের জন্য রোগ মুক্তি রয়েছে- সূরাহ্ আন-নাহ্‌ল আয়াত ৬৯।

বরকতময় খাদ্যবস্তুর মধ্যে রয়েছে, যমযম কূপের পানি। রাসূল (ﷺ) বলেন: যমযমের পানি হচ্ছে বরকতময় এবং তা আহারকারীদের জন্য সুস্বাদু খাবার- সহীহ্ মুসলিম শরহে ইমাম নব্বী (রহঃ) ১৬/৩০।

বরকতময় খাবারের মধ্যে রয়েছে: বৃষ্টির পানি। আল্লাহ্ ﷻ বলেন:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا

অর্থ: আমি আকাশ হতে বরকতময় পানি অবতীর্ণ করেছি- সূরাহ্ ক্বাফ আয়াত -৯। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ﷺ বলেন: একদা বৃষ্টির সময় আমরা রাসূল (ﷺ) এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি ﷺ তাঁর জামা খুলে ফেললেন এবং তাঁর শরীরে বৃষ্টির পানি লাগল। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), আপনি এমনটি করলেন কেন? তিনি ﷺ বললেন: কেননা তা আল্লাহর নিকট হতে এখনি অবতীর্ণ হয়েছে- শরহে সহীহ্ মুসলিম ইমাম নব্বী ৫/১৯৫।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে: যখন আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হতো তখন রাসূল তাঁর দাসীকে বলতেন: (আমার ঘোড়ার জ্বীন এবং আমার কাপড়গুলো বৃষ্টিতে বের করো। এর পর তিনি কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا

অর্থ: আল্লাহ ﷻ বলেন: আমি আকাশ হতে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি- সূরাহ্ ক্বাফ আয়াত ৯। আল-আদাবুল মুফরাদ ১৮০ পৃষ্ঠা।
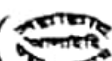
এমনিভাবে ঘোড়াতেও বরকত রয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন: (ঘোড়ার কপালে রয়েছে বরকত)। তিনি ﷺ আরও বলেন: (ঘোড়ার কপালে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ লিখিত রয়েছে, তা হচ্ছে: প্রতিদান বা সওয়াব এবং গণিমত। অর্থাৎ, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে মুজাহিদ সওয়াব ও গণিমত অর্জন করে থাকেন- সহীহু বুখারী ৩/২১৫।

ছাগলেও বরকত রয়েছে। রাসূল (ﷺ)কে ছাগল বাঁধার স্থানে সালাতের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ﷺ বললেন: (তোমরা ঐ স্থানে সালাত আদায় কর, কেননা ছাগল হচ্ছে বরকতময় পশু)- সহীহ্ আবূ দাউদ ১/৩৭।

উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: তুমি ছাগল পালন কর, কেননা তাতে বরকত রয়েছে-

সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ ২/৩২, ইবনে মাজাহ্ হাদীস নং ২৩০৪।

খেজুর গাছেও বরকত রয়েছে: আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আমরা একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে বসেছিলাম। তখন তাঁর নিকটে একট পুরুষ খেজুর গাছের মাথী নিয়ে আসা হলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন: এমন একটি গাছ রয়েছে যার বরকত মুসলিমের বরকতের ন্যায়। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আমার মনে হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দ্বারা খেজুর গাছকেই বুঝাতে চেয়েছেন। আমি বলতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ। কিন্তু চেয়ে দেখি আমার বয়স মাত্র দশ বছর, আর আমি সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। (বড়দের সম্মানের প্রতি খেয়াল করে) আমি চুপ থাকলাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ- সহীহুল বুখারী ৬/২১১।

খাদ্য ও পানীয় বস্তুসমূহের মধ্যে পূর্বোল্লেখিত বস্তুগুলোতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বিশেষভাবে বরকত দান করেছেন। তবে ঐ সকল বস্তুর মাধ্যমে বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত বৈধ পন্থা অতিক্রম করা যাবে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিষিদ্ধ বা অবৈধ বরকত অর্জন
ভূমিকা:

জাহিলিয়াতের প্রাথমিক যুগের লোকেদের বরকত অর্জন: কিতাবের প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুবারাকের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে যার পক্ষ থেকে ব্যাপক কল্যাণ আসে। আর বরকতের অর্থ বৃদ্ধি ও বেশী হওয়া। জাহিলিয়াতের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাদের ধন-সম্পদ, শরীর, গোত্র, ছেলে-সন্তান এবং পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। এটাই হচ্ছে বরকতের মূল যা তারা তাদের মূর্তিদের নিকটে চাইত। কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ সকল মূর্তির পক্ষ হতে ব্যাপক কল্যাণ আসে। ঐ মূর্তিগুলি অত্যন্ত বরকতময়। এমনকি যারা সকল কাজকে আল্লাহর প্রতি সন্বন্ধ করত তারাও বিশ্বাস করত যে, এ সকল মূর্তি ও তার মধ্যে নিহিত রুহানী শক্তি আল্লাহর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। (আল্লাহ কাফিরদের এ সকল কথা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র)।

তাদের এ বিশ্বাসের কারণ ছিল যাতে করে ঐ সকল মূর্তি তাদের উদ্দিষ্ট বিষয়টিকে বাস্তবায়ন করে। এটাই হচ্ছে তাদের কথার ভাবার্থ যা মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَا

অর্থ: আমরা তো ঐ মূর্তিগুলির ইবাদাত এ জন্যই করে থাকি যাতে করে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে।

এ জন্যই তাদের ঐ বরকত অনুসন্ধান করা ছিল জাহিলিয়াতের প্রথম যুগের পৌত্তলিকতার বহি:প্রকাশ মাত্র।

আলুসী (রহঃ) বলেন: জাহিলি যুগে মক্কার প্রতিটি বাড়ীতে একটা করে মূর্তি ছিল তারা তার ইবাদাত করত। যখন তাদের কেউ সফরে যেত তখন সর্বশেষে ঐ মূতিটিকে মাসাহ্ বা স্পর্শ করে বের হতো। আবার যখন সফর হতে ফিরে আসত তখন সর্ব প্রথম মূর্তির ঘরে প্রবেশ করে তা মাসাহ্ করত- বুলুগুল আরাব ফি মারিফাতি আহওয়ালিল আরাব ২/২০৬।

লেখক বলেন: কোন সন্দেহ নাই যে উক্ত মাসাহকারী তার এ মূর্তি মাসাহ্ করার মাধ্যমে নিজের শরীরে বরকত অর্জন করাই উদ্দেশ্য করে থাকে। কেননা, মূর্তি হচ্ছে তার নিকটে বরকতময়, ঐ বরকতের কিছু অংশ তার কাছে চলে আসে। কখনো কখনো মাসাহ্ কারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য হয় ঐ মূর্তিকে সম্মান দেখানো এবং তার নিকটে বরকত প্রার্থনা করা।

ছালেহী বলেন: ইবনে ইসহাক বলেছেন: মক্কার কাফেরেরা ধারণা করত ইসমাঈল عليه السلام এর বংশধরদের মধ্যে পাথরের প্রাথমিক ইবাদাতের ধরণ এরকম ছিল যে, তাদের কেউ যখন মক্কা হতে ফেরত আসার ইচ্ছা করত, আর ঐ ব্যক্তি দেশে ভাল ভাবে জীবন যাপন করতে চায়, তখন সে মক্কার সম্মানার্থে হারাম শরীফের একটা পাথর নিয়ে আসত। তারা যেখানেই অবস্থান করত সেখানে ঐ পাথরটিকে রেখে বাইতুল্লাহ্ শরীফের ন্যায় তার চতুর্দিকে ত্বওয়াফ করত।

এটা তাদেরকে যে কোন সুন্দর পাথরের ইবাদাতের প্রতি ধাবিত করে। পরবর্তীতে তাদের বংশধরেরা পূর্ববর্তীদের পথ ভূলে গিয়ে ইবরাহীম عليه السلام ও ইসমাঈল عليه السلام এর ধর্মকে পরিবর্তন করে এবং মূর্তি পূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের পূর্বের পথভ্রষ্টরা যে সকল গোমরাহীর কর্মে লিপ্ত হয়েছিল তারাও তাতে লিপ্ত হয়ে যায়। এ পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা কাবা ঘরের সম্মান ও ত্বওয়াফ করত।

সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ লিস্‌সালিহী ২/২৪২।

পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, শরীয়ত বহির্ভূত পদ্ধতিতে মক্কার পাথরকে সম্মান করা, তা দ্বারা বরকত অর্জন, তখনকার লোকেদেরকে মূর্তি পূজা ও তাকে সম্মান প্রদর্শনের প্রতি ধাবিত করেছে। পরবর্তীতে তারা এ সকল মূর্তির উদ্দেশ্যে পশু জবাই ও নযর, মানতসহ বিভিন্ন প্রকার ইবাদাত করা শুরু করে। তারা বিশ্বাস করত যে, ঐ সকল মূর্তিগুলো তাদের জান ও মালের ক্ষেত্রে উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে।

একাধিক সূত্রে জানা যায় যে, জাহিলিয়াতের লোকেরা ঐ সকল বড় বড় মূর্তির মাধ্যমে তাদের পশু ও ধন সম্পদে বরকত লাভের আশায় সেগুলোকে মূর্তির নিকটে নিয়ে আসত।

সালিহী বলেন: মালিকান বিন কেনানাহ্ বিন খোযাইমাহ বিন মুদরেকাহ গোত্রের "সাদ" একটা মূর্তি ছিল। তা ছিল প্রশস্ত ময়দানে এবং পাথরের তৈরী। বানী মালিকান গোত্রের এক ব্যক্তি তার উটকে ঐ মূর্তির চত্বরে বাঁধার জন্য নিয়ে আসে। যাতে করে তাদের ধারণা অনুযায়ী ঐ উটে বরকত হয়। উটটি কে ছেড়ে রাখা হতো এবং ইতিপূর্বে তা বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। আর ঐ মূর্তির উপরে রক্ত প্রবাহিত করা হতো। উটটি ঐ মূর্তিকে দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে দিক বিদিক ছুটাছুটি করতে লাগল এবং পালিয়ে গেল।

ফলে উটের মালিকান গোত্রের লোকটি একটা পাথর হাতে নিয়ে ঐ মূর্তির দিকে নিক্ষেপ করে বলল: হে মূর্তি তুমি আমার উটকে আতঙ্কিত করেছে আল্লাহ্ যেন তোমাতে বরকত না দেন।

অতঃপর উটটিকে খুঁজে নিয়ে এসে দেখতে পেল, মানুষেরা ঐ মূর্তির কাছে একত্রিত হয়েছে। তখন সে বলল: আমরা সাদ মূর্তির কাছে এ জন্য এসেছিলাম যে, সে আমাদের মর্যাদাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে একত্রিত করবে। অথচ দেখা যাচ্ছে সাদই আমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে, অতএব, এ সাদের আমাদের প্রয়োজন নেই। সাদ মূর্তি তো যমীনের একটা পাথর ছাড়া কিছুই নয়। তা কাউকে পথভ্রষ্ট বা সঠিক পথের দিশা দিতে পারে না- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ লিসসালিহী ২/২৪৩। মালিকান গোত্রের লোকটির শেষের কথা থেকে বুঝা যায় সে সঠিক পথের দিকে ফিরে এসেছে এবং জানতে পেরেছে যে, মূর্তি কোন বরকত দিতে সক্ষম নয়। তার নিকটে কোন কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করাও ঠিক নয়। কেননা, তা এমন এক পাথর যা কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না। ঐ ব্যক্তির নিকটে এ বিষয়টি পরিষ্কার না হলে সে মূর্তিটিকে পাথর দ্বারা আঘাত করত না।

বিশেষত সে তার বাক্যে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই মূর্তি সঠিক পথ দেখাতে বা পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ সে এ কাজের দাবী করারও যোগ্য নয়। অথচ জাহিলি যুগের লোকেরা মূর্তি উপকার বা অপকার করতে সক্ষম এ বিশ্বাস পোষণ করত।

জাহিলি যুগের লোকেরা এ ব্যক্তির মতো কাজ করার সাহস দেখাতো না। কেননা, তারা ভয় করত যে, এরূপটি করলে মূর্তি তারা ক্ষতি করবে। যেমন দেখা যায় সাক্বীফ গোত্র তাদের তৈরীকৃত লাত মূর্তিটি ভাঙ্গার ক্ষেত্রে খুব ভীত হয়ে পড়ে এবং ধারণা করে, যে ব্যক্তি ঐ মূর্তিটি ভাঙ্গবে সে অতি সত্বর কোন ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরিশেষে বিষয়টি তাদের নিকটে স্পষ্ট হয়ে উঠে। (যে, মূর্তির উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা নেই)। তাদের অগ্রগামী দলের সর্দার রাসূল (ﷺ)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ......আমাদের রাব্বাহ মূর্তির বিষয়টি কি আপনি খেয়াল করেছেন, আমরা তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিব?

রাসূল (ﷺ) বললেন: তোমরা তা ভেঙ্গে ফেল। তারা বলল: হায় আফসোস! ওাব্বাহ যদি জানতে পারে যে, আপনি তাকে ভাঙ্গতে চান, তাহলে সে তার পূজারীদের সবাইকে হত্যা করবে। তখন উমার বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) বললেন: ধ্বংস হও তোমরা, তোমরা কতইনা বোকা! রাব্বাহ

মূর্তি তো একটা পাথর ছাড়া কিছুই না । তারা বলল: হে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আমরা তোমার নিকটে আসিনি।

এরপর তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওটা ভাঙ্গার ব্যাপারে আপনিই নেতৃত্ব দিবেন। আমরা এটা কখনো ভাঙ্গতে পারব না। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: আমি তোমাদের নিকটে এমন ব্যক্তিদেরকে পাঠাব যারা ঐ মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে যথেষ্ট হবে। এ কথা শুনে তারা তাদের গোত্রের কাছে ফিরে গেল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরবর্তীতে তাদের নিকটে একটা ছোট সৈন্য দল প্রেরণ করলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আবূ সুফিয়ান বিন হারব এবং মুগীরা বিন শোবা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) । তাদের (প্রেরিত দলের) আমীর নিযুক্ত করলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে।

যখন সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সাক্বীফ গোত্রের নিকটে আসলেন, তখন লাত নামক মূর্তিটি ভাঙ্গার জন্য সে দিকেই সর্ব প্রথম অগ্রসর হলেন। ঐ গোত্রের সকল পুরুষ-মহিলা, ছোট বাচ্চারা মূর্তির চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি হাঁটতে না পারা বৃদ্ধ এবং দাসীরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারা মনে করলো যে, সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এ মূর্তি ভাঙ্গতে সক্ষম হবেন না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, লাত নামক মূর্তিটিকে যারা ভাঙ্গতে আসবে সে তাদেরকে অবশ্যই প্রতিহত করবে বা বাধা দিবে।

মুগীরাহ বিন শো'বাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটা বড় কুড়াল নিয়ে তাঁর সাথীদেরকে বললেন: আমি কি সাক্বীফ গোত্রের লোকদের সামনে তোমাদেরকে একটু হাসাবো না? তাঁরা বললেন: অবশ্যই। মুগীরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুঠার দিয়ে লাত মূর্তিকে একবার খুব জোরে আঘাত করতঃ চিৎকার করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাওয়ার ভান করলেন। উপস্থিত সাক্বীফ গোত্রের লোকেরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো যে, মুগীরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে ভূপাতিত ও ধরাশায়ী করেছে। তারা এ বলে এগিয়ে আসল যে, কি হে মুগীরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দেখলে লাতের কি শক্তি! তুমি তাকে ভাঙ্গতে পারলে না, তুমি কি জানোনা যে ব্যক্তি লাতের সাথে শত্রুতা করে সে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

তারা বলল আপনাদের কারও যদি হিম্মত থাকে তবে যেন কাছে এসে লাত মূর্তিকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করেন। আল্লাহর শপথ! আপনারা কখনো এটা ভাঙ্গতে সক্ষম হবেন না। মুগীরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তখন হাস্যরত অবস্থায় লাফ দিয়ে উঠে বললেন: আল্লাহর শপথ! হে সাক্বীফ গোত্রের লোকেরা, আমি তোমাদেরকে নিয়ে একটু হাসি-ঠাট্টা করলাম মাত্র। এটাতো পাথর ও

ইটের তৈরী একটা মূর্তি ছাড়া কিছুই নয়। এরপর মূর্তির দরজায় প্রচন্ড বেগে আঘাত করে তা ভেঙ্গে ফেললেন।

এর পর সাহাবাগণ ﷺ তার সকল খুটি ও স্তম্ভ ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। তখন ঐ মূর্তির ঘরের চাবিওয়ালা বলতে লাগল মাটির নিচে মূর্তির যে ভগ্নাংশ বাকী রয়েছে তারা অবশ্যই রাগ করবে এবং যারা তাকে ভেঙ্গেছে তাদেরকে মাটিতে প্রোথিত করবে বা মাটিতে দাবিয়ে দিবে। মুগীরাহ্ বিন শো'বাহ্ (رضي الله عنه) যখন এ কথা শুনলেন তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ (رضي الله عنه) এর নিকটে অনুমতি নিয়ে মূর্তির তলদেশ খনন করতঃ তার নিম্নাংশ বের করে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন। অতঃপর ঐ মূর্তির গায়ে যে সকল স্বর্ণ এবং মূল্যবান পোশাক ছিল তা নিয়ে চলে আসলেন।

দেখুন আদ-ইয়ানুল 'আরাব ফিল জাহিলিয়া, মুহাম্মাদ নূমান বিন জারিম পৃষ্ঠা ১৫০, আররওযুল উনফ লিস সুহাইলি ৪/১৯৯।

হে প্রিয় পাঠক! ঐ ব্যক্তির কর্মের প্রতি খেয়াল করুন, যে তার সাদ নামক মূর্তিকে অস্বীকার করেছে। কেন ঐ মূর্তিকে দেখার পর তার উটটি দিক বিদিক ছুটাছুটি করতে লেগেছিল এবং তাকে বরকত দেয়নি?

অপর ঘটনায় দেখা যায় গাবী বিন আব্দুল উযযা আস-সুলামী বানী সুলাইম গোত্রের কোন এক মূর্তির কাছে ছিলেন, বলা হয় সে মূর্তিটি ছিল সুওয়া'। তিনি দেখতে পেলেন দু'টি শৃগাল এসে তার মাথায় চড়ে পেশাব করে দিল। তখন গাবী বিন আব্দুল উযযা গেয়ে উঠলেন:

أَرَبٌّ يَبُوْلُ الثَّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ....لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ (تفسير

شعرابي ١/٥١٥١)

অর্থ: শৃগাল যার মাথায় পেশাব করে সে কি করে রব্ব বা প্রতিপালক হতে পারে? যার উপর শৃগালও পেশাব করে সে সর্বাধিক নিকৃষ্ট, নিচু এবং হীন। তারপর গাবী বিন আব্দুল উযযা বললেন: হে সুলাইম সম্প্রদায়! আল্লাহর শপথ, এই মূর্তি কোন উপকার বা অপকার করতে সক্ষম নহে। সে কাউকে কিছু দান করা বা বাধা দেয়ার ব্যাপারে কোনই ক্ষমতা রাখে না। এরপর তিনি ঐ মূর্তিটিকে ভেঙ্গে ফেললেন।

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূল (ﷺ) এর সাথে মিলিত হলে তিনি ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নাম কি? তিনি বললেন: গাবী বিন আব্দুল উযযা।

রাসূল (ﷺ) বললেন: না, বরং তোমার নাম রাশেদ বিন আব্দে রাব্বিহি। এরপর রাসূল (ﷺ) তাকে তার সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের দায়িত্ব

অর্পণ করলেন- দেখুন, আল-মাফসাল ফি তারিখিল আরাব ক্বলাল ইসলাম। ড: যাওয়াদ আলী ২৫৯ পৃষ্ঠা।

বানী সালামাহ গোত্রের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা আমর বিন জামুহ স্বীয় গৃহে বাঁশ জাতীয় জিনিষ দিয়ে একটা মূর্তি তৈরী করেছিলেন। যখন বানী সালামাহ গোত্রের কিছু যুবক ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তারা ঐ মূর্তিটিকে ময়লা আবর্জনাযুক্ত একটা কুপে নিক্ষেপ করলেন এবং সাথে তার গলায় একটা মরা কুকুর বেঁধে দিলেন। আমর বিন জামূহ যখন এ দৃশ্য অবলোকন করলেন তখন তিনি সঠিক পথে ফিরে এলেন অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং গেয়ে উঠলেন:

والله لو كنت إلها لم تكن * أنت وكلب وسط بئر في قرن

أف لكلقاك إلها مستدن * الآن فتشناك عن سوء الغبن

الحمد لله العلي ذي المنن * الواهب الرزق ديان الدين

هو الذي أنقذني من قبل أن * أكون في ظلمة قبر مرتهن

(أنظر أديان العرب في الجاهلية صـ ١٥٧)

অর্থ: আল্লাহর শপথ! হে মূর্তি যদি তুমি মাবূদ হতে তবে তুমি ও কুকুর এরূপ একটা নিকৃষ্ট কূপে একত্রিত হতে না। তোমার এভাবে পড়ে থাকাকে শত ধিক! তুমি কতইনা নিচু মাবূদ ছিলে! এখন আমাদের নিকটে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমস্ত প্রশংসা সেই সু উচ্চ মহান রব্বুল আলামীনের জন্য যিনি সকলের রিযিক্বদাতা, সকলপ্রকার অনুগ্রহ তাঁর নিকট হতেই আসে।

কেবল মাত্র তিনিই ধর্ম প্রবর্তনের ক্ষমতা রাখেন। সে আল্লাহই আমাকে কবরের অন্ধকারে এবং জাহান্নামে যাওয়ার আগেই রক্ষা করেছেন। দেখুন আদইয়ানুল 'আরাব ফিল জাহিলিয়াহ ১৫৭ পৃষ্ঠা।

জাহিলিয়াতের প্রথম যুগে মূর্তি এবং কবর পূজার মাধ্যমে বরকত অর্জনের আরেকটা ধরণ এমন ছিল যে, তারা ধারণা করত: এ সকল মূর্তি তাদের যুদ্ধাস্ত্রসমূহে বরকত দিয়ে থাকে। আর এ বরকতের কারণে তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। এর সত্যতা প্রমাণ করে আবূ ওয়াক্বিদ লাইসির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাদীস। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমরা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম। উল্লেখ্য যে, আমরা সদ্য কুফরী ত্যাগ করে নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। মুশরিকদের একটি বরই গাছ ছিল। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তারা ঐ গাছের নিচে

অবস্থান করত এবং তাদের অস্ত্রগুলো ঐ গাছে ঝুলিয়ে রাখতো। গাছটিকে বলা হতো যাতু আনওয়াত।

আমরা যখন ঐ গাছের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম তখন বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), আমাদের জন্যও তাদের মতো একটা যাতু আনওয়াত নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ﷺ) আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন: আল্লাহু আকবার! (আল্লাহ মহান ও সবার বড়)। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা এমন এক রীতি নীতির কথা বলেছো যেমনটি বলেছিল বানী ইসরাঈল মূসা (আঃ) কে। তারা বলেছিল: হে মূসা (আঃ) মাবূদ নির্ধারণ করে দিন।

তোমরা (হে আমার উম্মত) অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ, রীতি নীতি পদে পদে অনুসরণ করবে- মুসনাদে আহমাদ ৫/২১৮। শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আলুশ শাইখ বলেন: মুশরিকরা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাদের অস্ত্রগুলো ঐ গাছে ঝুলিয়ে রাখত-

ফতহুল মাজীদ ১৪৩ পৃষ্ঠা।

জাহিলিয়াতের প্রথম যুগের লোকেরা কেবল মাত্র মূর্তি ও কবরের মাধ্যমে বরকত অর্জন করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং মূর্তি ও কবরের খাদেম এবং তাদের কাপড়ের মাধ্যমেও বরকত অর্জন করত। কেননা তারা সর্বদা মূর্তির খেদমত করত এবং মুতির কাছেই থাকত।

ইমাম শাতূবী রহঃ বলেন: তারা কখনো এ সকল মূর্তির মাধ্যমে এমন বিষয়ে বরকত লাভের বিশ্বাস রাখতো যা ঐ মূর্তির মাঝে নেই। আর এ বরকত অর্জনেই হচ্ছে মূল ইবাদাত।

এ জন্যই যে গাছের নিচে রাসূল (ﷺ) এর সাথে সাহাবাগণ (রাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় বাইয়াত (অঙ্গিকার) করেছিলেন উমার (রাঃ) তা কেটে ফেলেছিলেন। বরং গাছের মাধ্যমে বরকত অর্জন করাটাই ছিল কবর ও মূর্তি পূজারী পূর্ববর্তী উম্মাতদের মূল ইবাদাত। ঐতিহাসিকগণ এমনটিই উল্লেখ করেছেন। দেখুন আল-ই'তিসাম লিশশাতুবী রহঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন স্থান ও জড় পদার্থের মাধ্যমে নিষিদ্ধ বরকত অর্জন করা

বরকতময় স্থানসমূহের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যেমন: মাসজিদ, ইসলামী রীতি-নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট পবিত্র স্থান সমূহ, মক্কা, মাদীনা, শামের ভূখন্ড এ সকল বরকতময় স্থানে বেশী বেশী কল্যাণ অর্জিত হয়। তবে এ সকল স্থানের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা শরীয়ত সমর্থিত নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেহেতু মাসজিদের জানালা, দরজায় ও চৌকাঠে চুমু খাওয়া যাবে না। মাসজিদের মাটি দিয়ে বরকত অর্জন করাও

যাবে না। ইসলামী শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত পবিত্র স্থানসমূহে শরীয়ত বহির্ভূত সময়ে বরকত লাভের আশায় অবস্থান করা যাবে না।

এটা এ জন্য যে, বরকত অর্জন বা অনুসন্ধান করা হচ্ছে ইবাদাত। আর ইবাদাতের ভিত্তি হচ্ছে অনুসরণ এবং শরীয়ত প্রবর্তক মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, ইবাদাত হতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) অনুসরণে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বলে দেয়া পদ্ধতিতে। কিন্তু বিদআতীরা এবং যারা غلو বা বাড়াবাড়ি করে তারা বরকতময় স্থানসমূহের মাধ্যমে বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে রাসূলের (ﷺ) অনুসরণকে মেনে নেয়নি।

বরং তারা রাসূলের (ﷺ) কথাকে গ্রহণ না করে সৎ ব্যক্তিদের কবর এবং প্রত্যেক ঐ সকল স্থানের মাধ্যমে বরকত অর্জন করে যেখানে কোন ভাল কাজ সম্পাদিত হয়েছে। যেমনঃ রাসূল (ﷺ) এর জন্মস্থান, ঐ সকল স্থান যেগুলোতে রাসূল (ﷺ) চলা-ফেরা করেছেন। অথবা যে সকল স্থানে রাসূল (ﷺ) সালাত আদায় করেছেন কিন্তু তা বরকতময় এটা তার ইচ্ছা ছিল না, অথবা ঐ সকল স্থান যেখানে রাসূল (ﷺ) বসেছেন। যেমনঃ জাবালে সাওর এর গুহা (এখানে তিনি হিজরতের রাত্রিতে অবস্থান করেছিলেন) ইত্যাদি।

ইউসুফ সাইয়িদ হাশেম রেফায়ী (বিদআতী) বলেছেঃ বরকতময় স্থান ও স্মৃতিসমূহ যেগুলোতে দু'য়া কবুল হওয়া ও তাকে মাধ্যম বানানোর আশা করা যায় সেগুলো হলোঃ মাসজিদ, কোন ব্যক্তির কবর ইত্যাদি। আর এ সকল ও অনুরূপ স্থানসমূহের উদ্দেশ্যে সফর করা শরীয়ত সমর্থিত কাজ! (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক)। দেখুনঃ রদ্দুল মুহকামুল মানী' ৭৫ পৃষ্ঠা।

মুহাম্মাদ উলাবী রাসূল (ﷺ) এর জন্মস্থান সম্পর্কে বলেছেঃ যে গৃহে রাসূল (ﷺ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তা ভেঙ্গে গিয়েছিল। মানুষেরা তা পরিত্যাগ করেছিল। পরবর্তীতে আল্লাহর অশেষ মেহের বানীতে পবিত্র মক্কা নগরীর সেক্রেটারী জেনারেল আব্বাস ক্বাত্বান বাদশা আব্দুল আযীযের অনুমতিক্রমে ঐ গৃহটি পুনঃ নির্মাণ করেন। উক্ত স্থানে বড় একটা লাইব্রেরী তৈরী করেন। যার নাম রাখা হয়েছে, মক্কা মুকাররমাহ লাইব্রেরী বলে। তা অধ্যয়নের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

সম্মানিত স্থানটিকে তার যথাযথ মর্যাদা দেয়ার জন্যই এরূপটি করা হয়েছে। দেখুন ফী রিহাবি বাইতিল হারাম পৃষ্ঠা ২৬৩। মুহাম্মাদ উলাবী

আব্বাস তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফী রিহাবিল বাইতিল হারামে একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন:

(الأماكن والمساجد المأثورة بمكة المكرمة وأطرافها)

অর্থাৎ, মক্কা শরীফ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ঐতিহ্য বাহি মাসজিদ ও উল্লেখ্যযোগ্য স্থানসমূহ। এর আওতায় তিনি রাসূল (ﷺ) এর জন্ম স্থান, খাদীজাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা'র গৃহ, আলী বিন আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্ম স্থান, দারুল আরক্বাম বিন আবিল আরক্বাম, হেরা ও সাওর গুহা ইত্যাদি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি উক্ত স্থানগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন যাতে করে তারা এগুলো যিয়ারত করত: তা দ্বারা বরকত অর্জন করতে পারে। মূলত: তার এ ইচ্ছা হচ্ছে সাহাবাগণের ﷺ হেদায়েত, পথ মত ও কর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিরোধী। দরজায় এবং ঐ সিন্দুক বা বাক্স যা তারা নিজেদের মাথার উপরে করে রাখে তাতে বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে চুমু খেলে কোন অসুবিধা নেই- নক্বশা বন্দিয়াহ্ ৫১ পৃষ্ঠা। কতক বেরলবী মুরুব্বী বলে থাকে যে, কবরের চতুর্দিকে তওয়াফ করতে কোন অসূবিধা নেই।

কেননা ওলী আওলিয়াদের কবর হচ্ছে, পৃথিবীতে আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন। এগুলোকে সম্মান করার আদেশ দেয়া হয়েছে-

আল বেরলবী, আক্বায়িদ ও তারিখ ১২৫ পৃষ্ঠা।

বিদ'আতীদের নিকট স্থানের মাধ্যমে বরকত অর্জনের ধরন এ রকমই হয়ে থাকে যা মানুষকে স্পষ্ট শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেমন: কবরে শায়িত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পশু যবেহ্ করা, নযর মানত করা, কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা, কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকটে সাহায্য ও বৃষ্টি প্রার্থনা করা। যেমনটি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ওলী নামক ব্যক্তিদের কবরের পাশে হতে দেখা যাচ্ছে।

এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, বরকত অর্জন হচ্ছে একটা ইবাদত । আর তার পদ্ধতি শরীয়ত প্রণেতা মুহাম্মাদ (ﷺ) থেকেই গ্রহণ করতে হবে। শরীয়ত সমর্থিত বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কোন সময়ই অতিক্রম করা যাবে না:

১। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাজরে আসওয়াদে এসে চুম্বন করত: বললেন:

إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ . وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

অর্থ: হে হাজরে আসওয়াদ নিশ্চয় তুমি একটা পাথর মাত্র। তুমি উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারনা। যদি আমি রাসূল (ﷺ) কর্তৃক তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তবে তোমাকে আমি চুম্বন করতাম না।

ইবনে মাজাহ্ ৯/১২।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ ফতহুল বারীতে অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, উমার (রাঃ) এর উপরোক্ত কথায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রবর্তকের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল (ﷺ) এর অনুসরণের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় মূল নীতি। আর তা এই যে, রাসূল (ﷺ) যা করেছেন আমাদেরকে তাই করতে হবে, যদিও সেই কর্মের তাৎপর্য জানা না যায়-

ফতহুল বারী শরহু সহীহ্ আল বুখারী ৩/৩৭০।

২। ইবনে ওয়ায্যাহ্ মারওয়ান বিন সুওয়াইদ আল আসাদী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা একদা আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর সাথে মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা হলাম। যখন ফজরের সময় হলো তখন তিনি আমাদেরকে ফজরের নামাজ পড়ালেন। এর পর তিনি দেখলেন মানুষেরা কোথায় যেন যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলেন: এরা কোথায় যাচ্ছে? বলা হলো হে আমীরুল মু'মিনীন এখানে একটা মাসজিদ রয়েছে যেখানে রাসূল (ﷺ) সালাত আদায় করেছিলেন, এ সমস্ত লোকেরা সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করবে!

তখন তিনি বললেন: এরূপ কর্মের দরুনই তোমাদের পূর্বের উম্মতেরা ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীদের স্মৃতি চিহ্নগুলো অনুসরণ করে সেগুলোকে গির্জা ও উপাসনালয়ে রূপান্তরিত করত। এ মাসজিদে এসে যার নামাজের সময় হয়ে যাবে সে এখানে নামাজ আদায় করবে। আর এ মাসজিদে এসে যার নামাজের সময় হবেনা সে যেন অত্র মাসজিদে সালাতের জন্য অপেক্ষা না করে তার যাত্রা অব্যাহত রাখে। অর্থাৎ যেখানে সালাতের সময় হবে সেখানে সালাত আদায় করবে। এ মাসজিদকে খাস করার কোন দলীল নেই। মা'রুক বিন সুওয়াইদ থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

দেখুন, ইবনে ওয়ায্যাহ্ কর্তৃক রচিত আল-বিদ' অন্নাহী গ্রন্থ ৪১ পৃষ্ঠা।

৩। ইমাম আহমাদ (রহঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে উমার বিন আব্দুর রহমান বিন হারস বিন হিশাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন: আবূ বুসরাহ্ গিফারী একদা তূর পর্বত হতে আসার পথে সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি (রাঃ) বললেন: তুমি কোথা থেকে আসছো? আবূ বুসরাহ্ বললেন: আমি তূর পর্বত হতে নামাজ পড়ে আসছি! আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বললেন: তুমি সেখানে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যদি আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হতো তবে তুমি সেখানে সালাত আদায় করার জন্য যেতে না।

আমি রাসূল (ﷺ)কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেন: (তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও নেকীর উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না)। অর্থাৎ, এ তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানকে ফযীলতপূর্ণ মনে করে সেখানে যাওয়া যাবে না। আর এ তিনটি মাসজিদ হলো: ১. মাসজিদে হারাম বা কাবা শরীফ, ২. আমার মাসজিদ বা মাসজিদে নব্বী, ৩. মাসজিদে আক্বসা। দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৬/৭, ইরওয়াউল গালীল ৪/১৪৩। হাদীসটি বুখারী মুসলিমেও রয়েছে।

৪। ইবনে সা'দ তার তাবাকত গ্রন্থে নাফে' থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: মানুষেরা রিযওয়ান বৃক্ষের নিকটে এসে সালাত আদায় করত। (উল্লেখ্য: রিযওয়ান বৃক্ষ ঐ গাছকে বলা হয় যার নিচে সকল সাহাবাগণ (রাঃ) রাসূলের (ﷺ) হাতে হাত রেখে বাইয়াত করেছিলেন)। উমার (রাঃ) এর নিকটে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ঐ সকল লোকদেরকে শাস্তির ভয় দেখালেন। অর্থাৎ তারা এ গাছকে কেন্দ্র করে যে বিদআত শুরু করেছে তার জন্য তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখালেন। সাথে ঐ গাছটিকে কেটে ফেলার আদেশ দিলেন এবং তা কেটে ফেলা হলো। দেখুন আত্তাবাক্বাত ২/১০০, মারবিয়াতু হুদাইবিয়াহ্ ১৩৭, আল বিদা' লি ইবনে ওয়াযযাহ ৪৩ পৃষ্ঠা।

৫। ইবনে ওয়ায্যাহ্ বলেন: মালিক বিন আনাস এবং মাদীনার অন্যান্য উলামাগণ (রহঃ) ঐ সকল মাসজিদ এবং রাসূলের (ﷺ) স্মৃতিগুলোতে যাওয়া অপছন্দ করতেন কেবল ওহুদ এবং মাসজিদে কুবা ব্যতীত। ইবনে ওয়ায্যাহ্ বলেন: আমি ঐ সকল উলামাগণকে বলতে শুনেছি যে, সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বাইতুল মুক্বাদ্দাসে প্রবেশ করে স্মৃতি অনুসন্ধান করেননি এবং (ঐ সকল স্মৃতিকে বরকতপূর্ণ মনে করে) সেখানে বিশেষ ধরণের কোন সালাত আদায় করেননি।

অনুরূপভাবে তাঁর যারা অনুসারী তারাও তাঁর মতো আমল করেছেন। নবীদের কোন স্মৃতি তারা অনুসরণ করতেন না। ওয়াক্বী (রহঃ)ও বাইতুল মুক্বাদ্দাসে এসে সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এর বিপরীত কোন কর্ম করেননি। আত্তাবাক্বাত ২/১০০, মারবিয়াতু গাযওয়াতুল হুদাইবিয়াহ্ ১৩৭, আল বিদ' লি ইবনে ওয়াযযাহ্ ৪৩ পৃষ্ঠা।

৬। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) স্বীয় সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: (তোমরা তোমাদের বাড়ী-ঘরকে (সেখানে সালাত এবং কুরআন তিলাওয়াত ত্যাগ করে) কবরে রূপান্তরিত করো না। আর আমার কবরকে ঈদ বা উৎসবের স্থানে পরিণত করবেনা। বরং তোমরা আমার উপর সলাত (দরুদ) পাঠ কর। কেননা, তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন তোমাদের সলাত (দরুদ) আমার কছে পৌঁছে যায়।

(রাসূল (ﷺ) এর কবরকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ হলোঃ রাসূলের (ﷺ) কবরকে উদ্দেশ্য করে দূর দুরান্ত হতে সেখানে গমন করা)-

সহীহ্ সুনানে আবূ দাউদ ১/৩৮৩, আবূ দাউদ হাদীস নং ২০৪২।

উল্লেখ্য শুধু কবর যিয়ারতে কোন অসুবিধা নেই। তবে কেউ যদি কোন কবরের বরকতের ধারণা করে সেখানে দুয়া করার জন্য বা কিছু চাওয়ার জন্য যায় এ বিশ্বাসে যে, এ কবরের নিকটে দুয়া করা অন্যান্য স্থানে দুয়া করার চেয়ে উত্তম বা ভালো এবং এ স্থানটি দুয়া কবুলেন অন্যতম স্থান, তাহলে এটা অবশ্যই ঐ কবরকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা হলো। আর যেখানে রাসূলের (ﷺ) কবরকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে অন্যের কবরকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা অনেক আগেই নিষেধ। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন: কোন ব্যক্তি যদি কোন নবীর বা সৎ ব্যক্তির কবরে গিয়ে ঐ কবর বা কবরস্থিত ভূখন্ডের বিশেষ বরকত রয়েছে মনে করে সেখানে সালাত আদায় করে তবে তা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রকাশ্য শত্রুতা এবং আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী এমন এক ধর্মের নব আবিস্কার যার অনুমোদন আল্লাহ্ ﷻ দেননি। মুসলমানগণ রাসূলের (ﷺ) ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু জেনেছেন সে অনুযায়ী এ ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছেন যে, কোন কবরের নিকটে সালাত আদায় করার সামান্যতম ফযীলত নেই, তা যে কারও কবর হোকনা কেন।

সাথে সাথে কবরস্থিত ঐ ভূখন্ডেরও কোন কল্যাণকর বিশেষত্ব বা প্রামাণ্যতা নেই। বরং ঐ কবর বা উক্ত ভুখন্ডের মন্দ প্রভাবই রয়েছে-

ইক্বতিযাউসসিরাতিল মুস্তাক্বীম ৩৩৪ পৃষ্ঠা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহঃ বলেনঃ কেউ যদি হেরা বা সাওর গুহায় সালাত আদায় ও তথায় আরাধনা ও দুয়া করার জন্য যায়, অনুরূপভাবে কেউ যদি তুর পর্বতে যায়, যেখানে আল্লাহ মুসা (আঃ) এর সাথে কথা বলেছিলেন, এছাড়াও কেউ যদি কোন পাহাড় বা অন্য স্থানে যায় যেখানে কোন নবীর কোন স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে বলে মনে করা হয় বা সেই স্মৃতিকে ঘিরে সেখানে কোন কিছু নির্মাণ করা হয়েছে যেমনঃ রাসূলের (ﷺ) জুতার স্থানে কোন স্মৃতি সৌধ নিমার্ণ করা, এসব কিছুই শরীয়ত বহির্ভূত কাজ। রাসূল (ﷺ) তাঁর স্থান ও মিনার পিছনে বাইয়াতুল আক্বাবার স্থানদ্বয়কে যিয়ারত করার অনুমতি দেননি।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত কর্মগুলো যদি শরীয়তসম্মত কোন ভাল কাজ হতো এবং আল্লাহ তাতে সওয়াব দান করতেন তবে রাসূল (ﷺ) সে সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানতেন এবং সবার আগে তিনিই তার প্রতি আমল করতেন। তাঁর সাহাবাগণকেও তা শিক্ষা দিতেন। তাঁর সাহাবাগণও অন্যদের থেকে সে ব্যাপারে বেশী জানতেন এবং পরবর্তীগণও সে ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহী হতেন।

যেহেতু উক্ত কাজগুলোর কোনটির প্রতি তারা সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ করেননি তখন জানা গেল যে তা হচ্ছে পথ ভ্রষ্টকারী বিদআত। সাহাবা ও তাবিয়ীগণ সেটাকে ইবাদাত, নৈকট্যশীল আমল বা অনুসরণীয় কাজ মনে করতেন না। অতএব, যে ব্যক্তি ঐ কাজগুলিকে ইবাদাত, নৈকট্যশীল ও অনুসরণীয় আমল বলে মনে করবে সে সাহাবা (রাঃ) ও তাবিয়ীগণের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্যের পথ অনুসরণ করল এবং ধর্মের ভিতরে এমন কিছু নতুন জিনিষের সংযোজন করল যার অনুমতি আল্লাহ (সুবঃ) দেননি।

দেখুন, ইক্তিযাউসসিরাতুল মুস্তাক্বীম ৪২৪-৪২৬ পৃষ্ঠা।

মান্যবর শাইখ অব্দুল আযীব বিন বায রহঃ ঐ সকল লেখকদের প্রতিবাদ করেছেন যারা রাসূল (ﷺ) এর স্মৃতিগুলোকে রক্ষা করার জন্য আবেদন করেছিলেন। যেমনঃ রাসূলের (ﷺ) হিজরতের পথ, উম্মে মা'বাদের তাঁবুর স্থানসহ অনুরূপ স্থানাদি যেখানে রাসূল (ﷺ) অবতরণ করেছিলেন বা যে স্থানে রাসূলের (ﷺ) কোন ঘটনা ঘটেছিল। সাথে সাথে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এরূপটি করলে মানুষেরা ঐ সকল স্থানকে সম্মান করা, তথায় দুয়া করা ও সালাত আদায় করা শুরু করবে। আর এ সকল কর্ম ও পথগুলোই মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে।

দেখুন মাজমু ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাতে ইবনে বায রহঃ ৩/৩৩৪।

এর দ্বারা বিশ্বস্ত সূত্রে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূল (ﷺ) যেখানে সালাত আদায় করেছেন, যেমন: তিনি কোন সফরে থাকা কালীন কোন স্থানে সালাত আদায় করেছেন কিন্তু রাসূল (ﷺ) কর্তৃক ঐ স্থানের বিশেষত্ব বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছিল না তাহলে ঐ স্থান খুঁজে সেখানে সালাত আদায় করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। কেননা রাসূল (ﷺ) ঐ স্থানের বিশেষত্ব বুঝাতে চাননি, বরং তিনি স্বাভাবিক ভাবে সালাত আদায় করেছেন। অতএব, সালাতের স্থান খুঁজে যেরূপ তার অনুসরণ করা শরীয়ত সমর্থিত নয়, তদ্রূপ রাসূল (ﷺ) এর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন স্থানকেও অনুসরণ করা যাবে না।

এ পর্যায়ে সর্বাগ্রে রয়েছে, হেরা গুহা যেখানে প্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল। সাওর গুহা, যেখানে রাসূল (ﷺ) এবং আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হিজরতের রাত্রে আত্ম গোপন করেছিলেন। বদর প্রান্তর, বাইয়াতুর রিযওয়ানের বৃক্ষের স্থান এবং উম্মে মা'বাদের তাঁবুর স্থান যেখানে রাসূল (ﷺ) এবং আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের হিজরতের পথে যাত্রা বিরতি করেছিলেন। উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে ঐ হাদীসের বৈপরিত্ব সৃষ্টি হয় না যে হাদীসটি ইমাম বুখারী রহঃ স্বীয় বুখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ

لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

অর্থ: ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাহমুদ বিন রবী' আল-আনসারী আমাকে সংবাদ দিয়েছেন: রাসূল (ﷺ) এর আনসারী ও বদরী সাহাবী মালেক (রাঃ) তাঁর (ﷺ) নিকটে এসে বললেন: আমি চোখে দেখতে পাইনা। আমি আমার ক্বওমের ইমামতিও করি।

যখন প্রবল বর্ষণ হয় তখন আমার বাড়ীর ও মাসজিদের মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলো পানির ঢলে মিশে যায় ফলে আমি তাদের সালাত পড়াতে মাসজিদে আসতে পারি না। হে আল্লাহর রাসূল, (ﷺ) আমার ইচ্ছা আপনি আমার বাড়ীতে এসে সালাত আদায় করবেন। পরবর্তীতে আমি ঐ স্থানটিকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করব। বর্ণনাকারী বলেন: তখন রাসূল (ﷺ) তাঁকে বললেন: আল্লাহ চাহেন তো আমি তা করবো।

উৎবান (রাঃ) বলেন: একদা সূর্য মাথার উপর উঠলে রাসূল (ﷺ) এবং আবূ বকর (রাঃ) আমার বাড়ীতে এসে অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁদেরকে অনুমতি দিলাম। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করে না বসেই বললেন: তোমার বাড়ীর কোন্ অংশে আমার নামাজ পড়া তুমি পছন্দ করো? আমি তাঁকে বাড়ীর এক দিকে ইশারা করে দেখালাম। রাসূল (ﷺ) দাঁড়িয়ে সালাতের জন্য তাকবীর দিলেন। আমরাও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাতের জন্য কাতারবন্দি হলাম। তিনি আমাদের কে নিয়ে দু রাকাত সালাত আদায় করলেন- আল হাদীস, সহীহুল বুখারী ২/১৯৭। ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী ১/৪৩৩।

পূর্বে উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে উৎবান (রাঃ) এর হাদীসের বৈপরিত্ব সৃষ্টি না হওয়ার কারণ হলো: যেখানে রাসূল (ﷺ) সালাত আদায় করেছেন সেই স্থানের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা উৎবান (রাঃ) এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (ﷺ) তাঁর বাড়ীতে এমন একটি স্থান নির্ধারণ করে দিবেন যেখানে প্লাবনের কারণে যখন তিনি মাসজিদে যেতে পারবেন না তখন সেখানে সালাত আদায় করবেন। অতএব, তাঁর ইচ্ছা ছিল রাসূল (ﷺ) তাঁর বাড়ীতে একটি অস্থায়ী মাসজিদের উদ্বোধন করে দিবেন। আর এ জন্যই ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে: "বাবুল মাসাজিদি ফিল বুয়ূত" বা গৃহে মাসজিদ তৈরীর অধ্যায় আলাদা ভাবে নিয়ে এসেছেন।

বারা বিন আযিব ও তাঁর বাড়ীর মাসজিদে জামাত করে সালাত আদায় করেছেন। এটা ছিল তাঁর জ্ঞানের বিচক্ষনতা।

অতএব, উৎবান এর উদ্দেশ্য ছিল রাসূল () জামাতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে তাঁর বাড়ীতে একটা স্থান নির্ধারণ করে দিবেন যেখানে প্রয়োজনের সময় তিনি সালাত আদায় করবেন। যেমনটি অপর সাহাবী বারা বিন আযীব তাঁর উক্ত কর্মের প্রতিবাদ করেননি। তখন ছিল শরীয়ত বা ওহী নাযিলের সময়। উৎবান এর উদ্দেশ্য এটাও থাকতে পারে যে, রাসূল () তাঁর জন্য সঠিক ক্বিবলা নির্ধারণ করে দিবেন। কেননা উৎবান যদি ক্বিবলা ছাড়া অন্য দিকে সালাত আদায় করতেন (কারণ তিনি অন্ধ ছিলেন) তবে রাসূল () ঐ ভুলকে সমর্থন করতেন না। অপর দিকে উক্ত স্থানের মাধ্যমে উৎবান যদি বরকত অর্জন করারই উদ্দেশ্য করতেন তবে তার মাধ্যমে বরকত অর্জন করা তাঁর ওয়ারিস ও পরবর্তীদের মাঝে চালু থাকত। যেমন ভাবে বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলের () চুল ও পানির পাত্র বংশ পরম্পরায় রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তবে ইবনে উমার হতে যা বর্ণনা করা হয় যে, রাসূল () যে সকল মাসজিদে সালাত আদায় করেছেন সে মাসজিদগুলো খুঁজে তিনিও সেখানে সালাত আদায় করতেন। (ফতহুল বারী ১/৪৭০)। তার এ কর্মে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে এরূপটি করতেন। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। বরং তিনি এরূপ করতেন রাসূল () এর অনুসরণের জন্য। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইবনে উমার পদে পদে রাসূল () এর অনুসরণ করতেন।

দেখুন, সিয়ারে আ'লামুন্ নুবালা ৩/২১৩ ও তৎ পরবর্তী পৃষ্ঠা।

অপর দিকে ইবনে উমার ঐ সকল স্থানে সালাত আদায়ের জন্য কখনো সফর করেননি। বরং যখন তিনি মাদীনাহ্ থেকে মাক্কাহ্ যেতেন তখন রাসূল ()যে সকল স্থানে নেমেছেন সেখানে নামার এবং যেখানে তিনি সালাত আদায় করেছেন সেখানে সালাত আদায়ের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন যাতে করে রাসূল () কে অনুসরণের সওয়াব পেয়ে যান। আর এটা ছিল ইবনে উমার -এর ইজতিহাদ। কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্য সাহাবাগণ ফিৎনার ভয়ে এ ব্যাপারে অগ্রসর হননি।

যেমনটি উমার বিন খাত্তাব সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, চার খলীফা (আবূ বকর, উমার, উসমান ও আলী) এবং অধিকাংশ সাহাবাগণ মক্কাহ্-মাদীনাহ্ অনেকবার সফর করেছেন।

কিন্তু কারও থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, তাঁরা সালাত আদায় বা দুয়া করার জন্য রাসূল (ﷺ) এর স্মৃতিগুলো অনুসন্ধান করেছেন। যদি তাঁরা তা করতেন তবে অবশ্যই তার প্রমাণ পাওয়া যেত, যেমনভাবে ইবনে উমার (رضي الله عنه) এর কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখক বলেন: রাসূল (ﷺ) যে স্থানে সালাত আদায় করেছেন তা অনুসরণের ব্যাপারে সাহাবাগণ ﷺ কর্তৃক যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা মূলত: দু' প্রকার: প্রথমটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সকল স্থান খুঁজে সেখানে সালাত আদায় ও দুয়া করার মাধ্যমে বরকত অর্জন করা শরীয়ত সমর্থিত নয় বরং বিদআত। দ্বিতীয়ত: এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজে চেষ্টা করতেন। সাহাবাগণ ﷺ তা জানতেন। যেমন: বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার পর মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করা। জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত বিদায় হজ্জেও হাদীসে এসেছে: (----অতঃপর রাসূল (ﷺ) মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে গিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্যে উচু স্বরে তিলাওয়াত করলেন:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

অর্থাৎ মাক্বামে ইবরাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো- সূরাহ আল বাক্বারাহ্ ১২৫ আয়াত।

এর পর তিনি ﷺ মাক্বামে ইবরাহীমকে তাঁর ও কা'বার মধ্যখানে রেখে দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। দেখুন, রাসূল (ﷺ) এর হজ্জ ৫৮ পৃষ্ঠা, লেখক: যুগ শ্রেষ্ঠ। মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)। এক্ষেত্রে সাহাবাগণ ﷺ রাসূলের (ﷺ) অনুসরণ করতেন। কেননা তারা জানতেন যে অত্র স্থানটিই হচ্ছে: উদ্দিষ্ট, ইঙ্গিত এবং কাংক্ষিত স্থান। অতএব, তা (মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করা) সুন্নাত। বিশেষত আয়াতের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (ﷺ) তা করেছেন।

বিদায় হজ্জে রাসূল (ﷺ) সাহাবাগণ ﷺকে হজ্জের বিধানাদি তাঁর (ﷺ) নিকট হতে গ্রহণের আদেশ দিতে গিয়ে বলেন: তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্জের বিধি-বিধান জেনে নাও। আমি জানিনা, হয়তো আমার এ হজ্জের পরে আমি আর কোন হজ্জ নাও পেতে পারি। দেখুন, রাসূল (ﷺ) এর হজ্জ ৮২ পৃষ্ঠা, লেখক: যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আল বানী (রহঃ)। আর তাওয়াফের পরে মাক্বামে

ইবরাহীমের পিছনে দ'রাকাত সালাত আদায় করা হজ্জের (এবং উমরারও) নিয়মের অন্তর্ভুক্ত।

এমনি ভাবে মাসজিদে নব্বীর রওযার মধ্যবর্তী পিলারের বা খুঁটির নিকটে সালাত আদায়ের জন্যও রাসূল (ﷺ) সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে ইয়াযীদ বিন উবাইদ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ইয়াযীদ) বলেন: আমি সালামাহ্ বিন আকওয়া (রাঃ) এর সাথে মাসজিদে নব্বীতে আসতাম।

যে পিলারের নিকটে কুরআন রাখা হতো অর্থাৎ মধ্যবর্তী পিলারের নিকটে তিনি সালাত আদায় করতেন। আমি তাঁকে বললাম: আমি আপনাকে এই পিলারের নিকটে সালাত আদায়ের জন্য খুব চেষ্টা করতে দেখি। (বিষয়টি খুলে বলবেন কি?)। তিনি (রাঃ) বললেন: আমি রাসূল (ﷺ) কে এই পিলারের নিকটে সালাত আদায়ে সচেষ্ট দেখেছি, অর্থাৎ রাসূল (ﷺ)ও এ পিলারের নিকটে সালাত আদায় করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। দেখুন ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী ১/৪৭৭।

এমনিভাবে যে সকল স্থানে সালাত আদায়ের গুরুত্ব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তার মধ্যে রয়েছে, মিনার মাসজিদে খায়েফ। হাদীসে এসেছে, সত্তর জন নাবী উক্ত মাসজিদে সালাত আদায় করেছেন। আলবানী (রহঃ) তাঁর تحذير الساجد গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মাক্বদেসী তাঁর মুখতার গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ২৪৯ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুনযেরী হাসান বলেছেন ২/১১৬। আযরাক্ব রচিত আখবারে মক্কার ৩৫ পৃষ্ঠায় হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

আর নবীগণ কর্তৃক অনুসন্ধান করে মাসজিদে খায়েফে সালাত আদায়ের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রমাণ করে যে, এটা শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং ঐ স্থানের ফযীলতের কারণেই তারা এরূপটি করেছেন। তবে সেখানে সালাত আদায় করা ওয়াজিব এমনটি নয়।

কেননা, যে সকল সাহাবী (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সাথে হজ্জ করেছিলেন তাঁরা সকলে মাসজিদে খায়েফে সালাত আদায় করেননি এবং রাসূল (ﷺ)ও তাদেরকে কিছু বলেননি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সময়ের মাধ্যমে নিষিদ্ধ বরকত অর্জন

পূর্বেই আমরা বরকতময় সময়সমূহের আলোচনা করেছি। যেমন: রমযান মাস, লাইলাতুল ক্বদর, জুমু'আর দিন। পূর্বে আমরা একথাও বর্ণনা

করেছি যে, এ সকল সময়ে বরকত অর্জন করা অবশ্যই শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে হতে হবে। যেমন: দু'য়া করা, সিয়াম পালন ইত্যাদি। যদি শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় উক্ত সময়গুলোর বরকত খোঁজা হয় তবে তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যেসন কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট করে জুমু'আ ও দুই ঈদের দিনে রোযা রাখে তবে তার এ কাজ পরিত্যাজ্য ও রাসূল (ﷺ) এর দেখানো পথের পরিপন্থি বলে গণ্য হবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট সময়ে বরকত অর্জন করা ইবাদাতের অন্তর্গত। অতএব, তা শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতেই হতে হবে। এর দ্বারা ঐ সকল লোকের ভুল স্পষ্ট হয়ে যায়, যারা নিজেদের পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু সময় কে সম্মান করতঃ ঐ সকল সময়ে নিজেদের মনগড়া কিছু ইবাদাত ও অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন।

যেমন: রাসূল (ﷺ) এর জন্ম দিবস পালন করা, ইসরা-মিরাজ দিবস বা রজনী পালন, হিজরত দিবস পালন, বিভিন্ন যুদ্ধ দিবস পালন করা যেগুলোতে মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছেন। যেমন: বদরের যুদ্ধ দিবস ইত্যাদি।

সীমালঙ্ঘনকারী ও বিদ'আত পন্থিরা এ প্রকার গর্হিত বরকত অর্জনে লিপ্ত হয়েছে। এমনকি তাদের অনেকে ধারণা করে যে, রাসূল (ﷺ) এর জন্ম দিবস লাইলাতুল ক্বদর হতে উত্তম!

দেখুন: মাফাহীম ইয়াজিবু আন্-তুসহহিহা, মুহাম্মাদ উলাভী মালিকী ১২০ পৃষ্ঠা।

যেমন ইউসুফ হাশিম রিফযী বলে: সুন্নাতে হাসানার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ সকল অনুষ্ঠানাদি যা মুসলমানগণ নির্দিষ্ট উপলক্ষ্যে পালন করে থাকেন যেমন: হিজরী নববর্ষ, রাসূল (ﷺ) এর জন্ম দিবস, মিরাজ দিবস বা রজনী, মক্কা বিজয় দিবস, বদর দিবসসহ অনুরূপ এমন দিবস পালন করা যাতে এমন কোন কল্যাণের বাস্তবায়নের ইচ্ছা করা হয় যা ধর্মীয় কোন স্বার্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করে- আর রদ্দুল মুহকামুল মানী' লির রিফায়ী ১৫২। সময় বা যুগের মাধ্যমে বরকত অর্জনের যে পদ্ধতিতে সীমালঙ্ঘনকারী ও বিদআতীরা পতিত হয়েছে তা নিছক ধর্মের মাঝে পথ ভ্রষ্টকারী বিদআতের উদ্ভাবন মাত্র। এটা ঢালাও ভাবে ধর্মের অংশ হতে পারে না। তার কারণ নিম্নরূপ:

১। এ সকল সময়ে অনুষ্ঠানাদি পালন এবং বরকত অর্জনের জন্য সে সময়ে বিশেষ ধরনের ইবাদাত করা যদি দ্বীনের কোন অংশ হতো তবে রাসূল (ﷺ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তা অবশ্যই তার উম্মতের জন্য বর্ণনা করে

যেতেন। কেননা, আল্লাহ ﷻ তাঁর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করেছেন। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম- সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ আয়াত ৩।

ইবনে কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: এই উম্মাতের (উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার) উপর আল্লাহর সব চেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে, তিনি ﷻ তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অতএব, তারা সে ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের প্রতি এবং তাদের নবী (ﷺ) ভিন্ন অন্য নবীর প্রতি মুখাপেক্ষী নয়।

এজন্যই আল্লাহ্ তাঁকে শেষ নবী করে মানুষ ও জিন জাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন। অতএব, তিনি যা হালাল-হারাম করেছেন তা ভিন্ন কোন হারাম নেই। তিনি যে শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন তা ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম সত্য নেই। তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তার সবই সত্য ও বাস্তব। সেখানে মিথ্যা ও বৈপরিত্যের কোন অবকাশ নেই। তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/২৩।

২। সময় বা যুগের মাধ্যমে বরকত অর্জন যদি তেমনটিই হতো যেমনটি বিদআতীরা করে থাকে, যেমন: বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করা এবং তাতে ইবাদাত করা, এটা যদি কোন ধর্মীয় কাজ হতো আর রাসূল (ﷺ) তা তার উম্মতের নিকটে বর্ণনা না করে থাকেন তবে তা রাসূল (ﷺ) কর্তৃক স্বীয় উম্মাতকে ধোকা দেয়ারই শামিল। অথচ সকল প্রকার ধোঁকা থেকে রাসূল (ﷺ) সম্পূর্ণ মুক্ত।

অপর দিকে বিদায় হজ্জের দিনে আরাফার দিবসে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণ জামায়েতে সকল উম্মাত এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, রাসূল (ﷺ) এর উপর অর্পিত রিসালাতের গুরু দায়িত্ব তিনি ﷺ সম্পূর্ণরূপে পৌছে দিয়েছেন। যেমন: বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সকল সাহাবাগণকে رضي الله عنهم জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আমার ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা আমার ব্যাপারে কি জবাব দিবে?

সাহাবাগণ সমস্বরে বলেছিলেন: আমরা ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দিব যে, আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার উপর অর্পিত রিসালাতের গুরু দায়িত্ব আপনি যথাযথ ও পরিপূর্ণরূপে আদায় করেছেন। উম্মাতের জন্য কল্যাণকর সকল নসীহতই আপনি বলে দিয়েছেন, কোনটিই গোপন রাখেননি।

তখন তিনি ﷺ স্বীয় তর্জনী বা শাহাদাত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করতঃ মানুষের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন: হে আল্লাহ! তুমি এ সকল লোকের কথার সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।

দেখুন, আল্লামা নাসীরুদ্দীন (রহঃ) রচিত রাসূল (ﷺ) এর হজ্জ ৭৩ পৃষ্ঠা।

৩। রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের পক্ষ হতে তথা শরীয়ত সমর্থিত নয় তা পরিত্যাজ্য ও অগ্রহণযোগ্য- ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী ১৩/২৭৬, ১৩/২১২। অর্থাৎ তা ঐ ব্যক্তির উপর প্রত্যাখ্যাত হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: নিশ্চয় সর্বোত্তম বানী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন, সর্বোৎকৃষ্ট হেদায়েত হচ্ছে রাসূল (ﷺ) এর দেখানো পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে ধর্মের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি ও সংযোজন করা।

তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হচ্ছে (মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় জিনিস) তা অবশ্যই আসবে এবং তোমরা আল্লাহ্ ﷻকে অক্ষম করতে পারবেনা। মৃত্যু ও ক্বিয়ামত যে হবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই-

ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখরী ১৩/২৭৬, ১৩/২১২।

অপর হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন: (আমি তোমাদেরকে এমন সুস্পষ্ট ও সহজ সরল পথের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত দিন সমান। অর্থাৎ তাতে অস্পষ্টতার কোন লেশ মাত্র নেই-

সহীহ ইবনে মাজাহ্ লিল আলবানী (রহঃ) ১/৬।

উল্লেখিত ও অন্যান্য আরো অনেক হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে যে, ধর্মের মাঝে বিদআতের কোন অবকাশ নেই। বিদআত পন্থিরা নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত, ইসলামী বিশ্বের কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরকত অর্জনের যে চাক-চিক্যময় বিদআতী পদ্ধতি চালু করেছে তা পরিত্যাজ্য ও অগ্রহণীয়।

৪। উল্লেখিত সময়ে অনুষ্ঠান ও মনগড়া নির্দিষ্ট কিছু ইবাদাতের মাধ্যমে যদি বরকত অর্জিত হতো তবে সাহাবাগণ (রাঃ) এবং সর্বোৎকৃষ্ট যুগের লোকগণ তা পরিত্যাগ করতেন না। অথচ তাঁরা ছিলেন কল্যাণকর

কাজে সর্বাধিক অগ্রগামী। অতএব, তাদের পথ ভিন্ন অন্য কোন পথে কল্যাণ থাকতে পারে না এবং নাই।

যেমন ইরবায বিন সারিয়াহ (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে তিনি বলেন: একদা রাসূল (ﷺ) আমাদের সম্মুখে ওয়ায করলেন। তাতে মানুষের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। মানুষের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। বর্ণনাকারী বলেন: আমরা বললাম: মনে হয় এটা আপনার বিদায় ভাষণ। অতএব, আপনি আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন।

রাসূল (ﷺ) বললেন: আমি তোমাদেরকে এমন সুস্পষ্ট পথের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত দিন সমান। অর্থাৎ তাতে অস্পষ্টতার লেশ মাত্র নেই। ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত কেউ সে পথ ছাড়া বক্র পথে চলতে পারে না। আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে।

সে অবস্থায় তোমদের দায়িত্ব হলো: তোমরা আমার এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশিদার (চার খলীফার) পথ অনুসরণ করবে এবং তা মজবুত ভাবে ধারণ করবে। সব সময় আমীরের আনুগত্য করবে- যদি কোন হাবশী (কালো) ব্যক্তিও তোমাদের আমীর হয়ে থাকেন। কেননা, মুমিন ব্যক্তি হচ্ছেন লাগাম বিশিষ্ট উটের মত। লাগাম লাগা উটকে যে দিকে টানা হয় সে দিকেই যায়। ঠিক তদ্রূপ মুমিন ব্যক্তিকে ইসলাম ও মুসলিম আমীর যা বলবেন তাই তাকে মানতে হবে-

সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ লিল-আলবানী (রহঃ) ১/১৪, ইবনে মাজাহ্ হাদীস নং ৪৩।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ নবী (ﷺ) এর জন্ম দিবস পালন সম্পর্কে বলেন: পূর্ববর্তী আলিম-উলামাগণের কেউই মীলাদ করেননি। অথচ মানুষ এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিল এবং ঐ সকল আলিমগণ যদি তা করতেন তবে তাদেরকে বাধা দেয়ার মত কেউ ছিল না। যদি এ মিলাদ মাহফিলে সামান্যতম কোন কল্যাণ থাকত তবে পূর্ববর্তী আলিমগণই আমাদের আগে তা পালন করতেন। কেননা, তারা রাসূল (ﷺ)কে আমাদের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন এবং অধিক সম্মান করতেন। তাছাড়া কল্যাণকর কাজে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী এবং অগ্রগামী ছিলেন। ইক্বতিযাউসসিরাতুল মুস্তাক্বীম ২৯৫ পৃষ্ঠা।

৫। ইসলামী ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত সময়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করা এবং তার মাধ্যমে বরকত অনুসন্ধান করা ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না। এ সকল অনুষ্ঠানাদি হচ্ছে বাতেনী সম্প্রদায়ের কুকর্মের ফসল।

ঐ সম্প্রদায় হচ্ছে উবাইদ আল-ক্বাদ্দাহ গোত্র যারা ফাতেমী নামে পরিচিত- আল ক্বওলুল ফাসল ফী হুকমিল ইহতিফাল বিমাওলিদে খাইরির রুসূল ৬৪ পৃষ্ঠা। ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) তার তারিখুল খোলাফা গ্রন্থে লিখেছেন:

ولم أحدا من الخلفاء العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة، لأمور منها: أنهم غير قرشيين. وإنما سمعتم بالفاطميين جهلة العوام، ولا فجدهم مجوسي

অর্থ: খলীফা বা খেলাফতের তালিকায় আমি উবাইদীঈনদের কারও নাম নিয়ে আসিনি। কেননা, বিভিন্ন কারণে তাদের নেতৃত্ব ছিল অবৈধ বা বাতিল। তার মধ্যে কয়েকটি কারণ হলো:

ক। তারা কুরায়শ বংশোদ্ভূত নয়। (অথচ খেলফত হবে কুরায়শ গোত্রের মধ্য হতে)।

খ। সাধারণ জনতা তাদেরকে ফাতেমী নামে আখ্যায়িত করেছেন।

গ। তাদের দাদা ছিল অগ্নি পূজক!!!

কাযী আবূ বকর আল-বাকিল্লানি বলেন: ক্বাদ্দাহ হচ্ছে উবাইদুল্লাহ এর দাদা। তার নাম ছিল মাহদী, সে ছিল অগ্নিপূজক। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন: মুহাক্কিক্বগণ (বিশ্লেষকগণ) এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, উবাইদুল্লাহ মাহদী উবাইদুল্লাহ উলাবী নয় বরং দুজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি।

ঘ। উবাইদীয়দের অধিকাংশ লোক ইসলাম বহির্ভূত যানাদেক্বাহ তথা নাস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাদের কেউ নবীগণ আলাইহিমুস সালামকে গালি দেয়। কেউ মদকে হালাল মনে করে। কেউ নিজেকে সিজদাহ করতে বলে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি হলো: রাফেযী শয়তান ও লম্পট যে সাহাবাগণ ﷺ কে গালি দেয়ার আদেশ দেয়। এ রকম লোকদের নিকটে বাইয়াত করা এবং তাদের ইমামতি (নেতৃত্ব) কোনটিই বৈধ নয় বরং অবৈধ ও বাতিল। দেখুন: তারিখুল খোলাফা ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) ৪ পৃষ্ঠা।

এ সকল লোকেরাই রাসূল প্রীতির জন্য নয় বরং ইসলামে বিদআত প্রবেশ করানোর মাধ্যমে তাকে ধ্বংস করার জন্য মীলাদের প্রচলন করেছিল। যেমন: কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী বলেন: মাহদী উবাইদুল্লাহ্ লম্পট সে ইসলামকে মুছে ফেলতে আগ্রহী বাতিনী সম্প্রদায়ের লোক।

অনেক আলিম ও ফক্বীহ্কে তারা হত্যা ও গুম করেছে যাতে করে মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। তার ছেলেরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করত: মদ, ব্যভিচারকে হালাল ফতোয়া দেয় এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে শিয়া মতবাদের প্রচার করে।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন: কায়িম বিন মাহদী তার পিতার থেকেও খারাপ, অধিক নাস্তিক ও অভিশপ্ত ছিল। সেই সর্ব প্রথম সাহাবাগণ ﷺকে গালি দেয়- তারিখুল খোলাফা লিস সুয়ূত্বী ৫ পৃষ্ঠা।

অনেক লোক এমন রয়েছে যে, তারা এ সকল লোকদের অনুসরণ করতঃ ধারণা করবে যে, তারা ভাল রীতিই চালু করে গেছে এবং মনে করবে যে, তাদের পথটাই বিশুদ্ধ পথ। যেমনটি বর্তমান সমাজের অবস্থা। এ বিদআত ও গর্হিত কাজগুলোই যেন মানুষের নিকটে শরীয়ত ও পুণ্যের কাজে রূপান্তরিত হয়েছে, আর মূল শরীয়ত মুসলমানদের নিকটে আজ অপরিচিত হয়ে গেছে!!।

৬। ইসলামী ঘটনা প্রবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালন এবং তার মাধ্যমে বরকত অনুসন্ধান করার মাঝে রয়েছে নাসারা বা খ্রীষ্টানদের কর্মের সাথে সাদৃশ্য। অথচ রাসূল (ﷺ) তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমন রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ: আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদেরই দলভূক্ত- সুনানে আবি দাউদ ১১/৪৮, মুসনাদে আহমাদ ২/৯২, ইরওয়াউল গালীলে আল বানী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন ৫/১০৯।

জাহান্নামবাসী তথা ইসলাম বিরোধী সকল শক্তির বিপরীত আমল করা যা বিরোধিতা করা অপরিহার্য এ ব্যাপারে সকল উলামাগণ একমত হয়েছেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ ইক্বতিযাউসসিরাতুল মুস্তাক্বীমে ইসলাম বিরোধী জাহান্নামী গোষ্ঠির বিরোধিতা করা অপরিহার্য বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। নাসারা বা খ্রীষ্টানেরাই মূলত জন্মোৎসব পালন করে থাকে। তারাই ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সময়কে ইবাদাতের মৌসুম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন: ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্কে মিরাজ ও উর্ধ্বগমন এবং লাইলাতুল ক্বদরের মধ্যে কোন্ রজনী উত্তম এ প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন: (মিরাজ রজনীতে খাস করে সালাত আদায় ও

অন্যান্য ইবাদাত করা শরীয়ত সম্মত করা হয়নি। সুতরাং তা (মিরাজ রজনীতে বিশেষ কোন ইবাদাত বন্দেগী করা) বিদ'আত।

পূর্ববর্তী কোন মুসলমান এ কথা বলেননি যে, অন্যান্য রজনীর উপর মিরাজের রাত্রির ফযীলত রয়েছে বিশেষত লাইলাতুল ক্বদরের উপর। অর্থাৎ লাইলাতুল ক্বদরের উপর মিরাজের রাত্রির তো কোন ফযীলত বা মর্যাদা নেই। অন্যান্য সাধারণ রাত্রির উপরও তার কোন মর্যাদা নেই। সাহাবাগণ رضي الله عنهم ও তাবিয়ীগণও (রহঃ) মিরাজ রজনীতে বিশেষভাবে কোন কাজ, ইবাদাত করতেন না। এরূপ কর্ম শরীয়ত সমর্থিত নয় বলেই কোন রাত্রে বিশেষ ভাবে ইবাদাত বান্দেগী করা সাহাবাগণ رضي الله عنهم থেকে পাওয়া যায় না।

এ কথা সত্য যে, মিরাজে গমণ রাসূল (ﷺ) এর জীবনের একটা মর্যাদাপূর্ণ অধ্যায়। এতদসত্ত্বেও সে রাত্রে ও যে স্থান থেকে তাঁকে ﷺ মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয় তাতে বিশেষ ভাবে ইবাদাত করার কোন শরয়ী সমর্থন নাই।

বরং হেরা গুহা যেখানে প্রথম ওহী নাযিল হয় এবং নবূয়ত লাভের পূর্বে রাসূল (ﷺ) সেখানে ধ্যান মগ্ন থাকতেন, নবূয়ত লাভের পর সেখানে তিনি নিজেও যাননি এবং তাঁর মক্কায় অবস্থান কালীন সময়ে কোন সাহাবীও رضي الله عنهم যাননি।

নবী ﷺ এবং সাহাবাগণ رضي الله عنهم ওহী নাযিল হওয়ার স্থানে ও সময়ে বিশেষ কোন ইবাদাত করেননি। অতএব, যে ব্যক্তি এরূপ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন সময় ও স্থানে ইবাদাত করা শুরু করবে তার সে কর্ম নাসারা ব খ্রীষ্টানদের সেই কর্মের মতোই হবে যারা ঈসা عليه السلام এর বিভিন্ন অবস্থাকে ইবাদাতের মৌসূম হিসেবে গ্রহণ করেছে। যেমনঃ তাঁর জন্মোৎসবসহ তাঁর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থাকে কেন্দ্র করে নাসারারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে- যাদুল মাআ'দ লি ইবনে ক্বাইয়িম (রহঃ) ১/৫৭ ও তৎ পরবর্তী পৃষ্ঠা।

৭। রাসূলের (ﷺ) জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সময়ের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বরকত অর্জন করা সেই বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের মধ্যেই অন্ত র্ভুক্ত হবে যা থেকে রাসূল (ﷺ) কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছেঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

অর্থ: আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন: তোমরা আমাকে নিয়ে ঐরূপ বাড়াবাড়ি করো না যেমন নাসারারা ইবনে মারঈয়াম বা ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি কেবল আল্লাহর একজন বান্দা। তাই তোমরা আমাকে তাঁর বান্দা ও রাসূল হিসেবেই অভিহিত করবে- সহীহুল বুখারী ১১/২৬২, মুসনাদে আহমাদ ১/১৪২।

৮। ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এ সকল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার বিদআত, অন্যায় অপকর্ম, কোন মজলিসে নারী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ, আবার কোন অনুষ্ঠানে শক্তিহীন সৃষ্টি জীবের নিকটে চাওয়া ও ফরিয়াদ করার মতো শিরকের ছড়াছড়িসহ নানা প্রকার অপকর্ম হতে দেখা যায়। ইসলামের ইতিহাসের মানদণ্ডে এ সকল অনুষ্ঠানের সত্যতা কতটুকু তা বুদ্ধিমানের নিকটে গোপন থাকার কথা নয়।

এ বিষয়ে অধিক জানার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলো পাঠ করুন:

١. كتاب المدخل لإبن الحاج
٢. الإبداع في مضار الإبتداع لعلي محفوظ
٣. القول الفصل للأنصاري
٤. حوار مع المالكي لإبن منيع
٥. الرد القوي للتويجري
٦. السنن والمبتدعات للشقيري
٧. الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف
٨. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لإبن النحاس
٩. حمك الإحتفال بالموالد النبوية وغيرها لإبن باز رحمه الله

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৎ ব্যক্তিদের স্বীয় সত্তা ও তাদের স্মৃতির মাধ্যমে নিষিদ্ধ উপায়ে বরকত অর্জন

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে বরকত অর্জনের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সাহাবাগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওযুর পানি, শরীরের ঘাম, চুল, পোশাকাদি এবং তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিষের মাধ্যমে বরকত অর্জন করতেন। আমার পিতা-মাতা তাঁর খিদমতে উৎসর্গ হোক, আল্লাহ তাঁর উপর সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন। এ বিষয়টা রাসূল

(ﷺ) এর জন্যই খাস। কোন নেককার বা সৎ ব্যক্তিকে রাসূল (ﷺ) এর সাথে এ ব্যাপারে তুলনা করা যাবে না। এমন কি খোলাফায়ে রাশেদীন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন এবং তাঁর স্ত্রীগণকেও তাঁর ﷺ সাথে তুলনা করা যাবে না। অন্যদের ব্যাপার তো দূরের কথা।

বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে যারা রাসূলের (ﷺ) সাথে অন্যকে তুলনা করে তারা এ মাসআলার ক্ষেত্রে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। এর দলীল হলো খোলাফায়ে রশিদীন এবং অন্যান্য সাহাবাগণের ﵃ আমল।

কোন ব্যক্তি থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, আবূ বকর, উমার, উসমান এবং আলী ﵃ এর ঘাম, কাপড়, ওযুর পানি, থুথু এবং তাঁদের কোন স্মৃতির মাধ্যমে বরকত অর্জন করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বরকত অর্জন হচ্ছে ইবাদাত। মানুষেরা আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ, প্রতিদান এবং সওয়াব পাওয়ার জন্যই তা করে থাকে। ইবাদাতের ভিত্তি কুরআন ও হাদীস তথা আল্লাহর বিধান এবং রাসূল (ﷺ) এর অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। রাসূল (ﷺ) ব্যতীত অন্য কারও দ্বারা যদি বরকত অর্জন বৈধ হতো তবে রাসূলের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবগণ তথা সাহাবাগণ ﵃ তা করতেন।

তাবিঈগণও সাহাবাগণের সাথে তা পালন করতেন। পরবর্তীতে তাবে তাবিঈগণ তাদের পূর্বপুরুষ এবং উলামাদের সাথে এরূপ বরকত অর্জনের চেষ্টা করতেন। যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাদের কেউ এরূপটি করেননি তাতে বুঝা যায় রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বরকত অর্জন করা শরীয়ত সমর্থিত নয় বরং শরীয়ত বহির্ভূত কাজ। ইমাম শাতুবী (রহঃ) বলেন: রাসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর পরে অন্য কারও মাধ্যমে সাহাবাগণ ﵃ বরকত অর্জন করেননি। রাসূলের (ﷺ) পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবূ বকর (رضي الله عنه)। তিনি ছিলেন রাসূলের (ﷺ) খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত অথচ তাঁর মাধ্যমে বরকত অর্জন করা হয়নি।

উমার (رضي الله عنه) তৎ পরবর্তী উৎকৃষ্ট মানুষ বা ব্যক্তি, তার মাধ্যমেও বরকত অর্জন করা হয়নি। অনুরূপভাবে উসমান, আলী ও অন্যান্য সাহাবাগণের ﵃ মাধ্যমেও বরকত অর্জন করা হয়নি। অথচ তারা ছিলেন উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

বিশুদ্ধ সূত্রে এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, কোন সাহাবার ﵃ মাধ্যমে কোন বরকত অর্জনকারী পূর্বে বর্ণিত পন্থায় বরকত অর্জন করেছেন। বরং লোকেরা তাঁদের কথা, কাজ ও চাল-চলনের মধ্যে সেগুলোরই কেবল অনুসরণ করেছেন যেগুলোতে তাঁরা আল্লাহর রাসূলের

(ﷺ) অনুসরণ করেছেন। অতএব, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলের স্বীয় যাত বা সত্ত্বার মাধ্যমে বরকত অর্জন করা হতো। পরবর্তীতে অন্যের মাধ্যমে অনুরূপ বরকত অর্জন করা যাবে না এবং এ ব্যাপারে সাহাবাগণ ﷺ একমত ছিলেন। তবে রাসূল (ﷺ) কিছু কাজ করেছেন সাহাবাগণ ﷺ তা করেননি, এ ব্যাপারে চিন্তার অবকাশ থেকে যায়।

এ ক্ষেত্রে দু'টি দিক রয়েছে:

১। সাহাবাগণের ﷺ বিশ্বাস ছিল যে, ঐ কাজটি রাসূলের (ﷺ) জন্য খাস ছিল এবং নবূয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে ঐ সকল কার্যাদি রাসূলের (ﷺ) জন্য বৈধ ছিল। যেমন: রাসূলের (ﷺ) মাধ্যমে বরকত ও কল্যাণ অর্জন করা।

কেননা, রাসূল (ﷺ) এর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছুই ছিল হেদায়েতের আলোয় উদ্ভাসিত। অতএব, এ হেদায়েতের আলো যে ব্যক্তি যেভাবে তাঁর নিকট হতে পেতে চেষ্টা করবে সে তা অর্জন করতে সক্ষম হবে। নবী ভিন্ন অন্যদের ব্যাপারটি এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য কারও অনুসরণের মাধ্যমে যদি কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় এ হেদায়েতের আলো অর্জন করতে সক্ষমও হয় তবে তা রাসূলের ﷺ হেদায়েতের মত হবে না বা রাসূলের ﷺ হেদায়েতের সাথে তার তুলনাও করা যাবে না। এ প্রকারটি রাসূলের (ﷺ) জন্যই খাস।

যেমন: চার এর বেশী বিয়ে করা, হাদিয়ার জিনিস রাসূল (ﷺ) কর্তৃক নিজের জন্য বৈধ ঘোষণা এবং রাসূল (ﷺ) কর্তৃক তাঁর স্ত্রীদের পালা বন্টনের বাধ্য বাধকতা না থাকা ও অনুরূপ বিষয়াদী। (শেষোক্ত বিষয়টি ঠিক নয় কারণ রাসূল (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের মাঝে পালা বন্টন করতেন)।

পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, রাসূলের (ﷺ) পরে কারও জন্য এ সকল কর্মে তাঁর ﷺ অনুসরণ করা বৈধ নয়। যেমন: চার এর বেশী বিবাহ করার ক্ষেত্রে রাসূলের (ﷺ) অনুসরণ করা বিদআত।

২। সাহাবাগণ ﷺ রাসূলের (ﷺ) কিছু কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ﷺ এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, এটা রাসূলের (ﷺ) জন্য খাস।

তবে বিশেষ কারণে সাহাবাগণ ﷺ তা পরিত্যাগ করেছেন। যেমন; মানুষ সেটাকে রীতি-নীতি ও রেওয়াজ এবং সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করবে এ ভয় থাকা। যেমনটি রাসূলের (ﷺ) স্মৃতিসমূহের অনুসরণ ও তা থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা এ ভয়ে যে, সাধারণ জনগণ

এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে না। বরং অজ্ঞতার দরুন সাধারণ জনগণ বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে বসবে। তাই তো দেখা যায় বরকত অর্জনে আগ্রহী অনেক ব্যক্তিই যার মাধ্যমে বরকত অর্জন করতে চায় তার ব্যাপারে এমন বিশ্বাস করে যা তার মধ্যে নেই। এ বরকত অর্জনই হলো ইবাদাতের মূল। এ জন্যই যে গাছের নিচে রাসূলের (ﷺ) সাথে সাহাবাগণ ﷺ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় বাইয়াত করেছিলেন বা শপথ নিয়েছিলেন উমার (رضي الله عنه) তা কেটে ফেলেছিলেন।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে পূর্ববর্তী লোকদের মূর্তি পূজার মূল কারণ ছিল এ বরকত অর্জন। তাই উমার (رضي الله عنه) ভয় করলেন যে, এখন লোকজন ঐ গাছের নিচে সালাত আদায় করছে, ক'দিন পর সে দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা শুরু করবে। পরিশেষে মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐ গাছের ইবাদাত বা উপাসনা করতে লাগবে। এমনি ভাবে গাইরুল্লাহর সম্মানের ক্ষেত্রেও তারা বাড়াবাড়ি করবে।

ফারগানী হাল্লাজ সম্পর্কে তারীখুত তাবারানীর পরিশিষ্টে লিখেছেন: হাল্লাজের সাথীরা তার মাধ্যমে বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। এমনকি তারা তার পেশাব নিয়ে শরীরে মর্দন করত এবং পায়খানা দ্বারা ধূপ জ্বালাত। পরিশেষে তারা হাল্লাজের মধ্যেও প্রভুত্বের গুণ রয়েছে বলে দাবী করে বসে। তারা যা বলে আল্লাহ ﷻ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে ও পবিত্র।

আল্লাহর বন্ধুত্বের বা ওলীর ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে যদি কিছু নিদর্শন প্রকাশ হয়েও থাকে তদুপরি বিষয়টি মূলত: গোপনীয়। কেননা, তা অপ্রকাশ্য বিষয় যা আল্লাহ ভিন্ন কেউ জানেন না। অনেক সময় দেখা যায় কেউ কোন ব্যক্তির ওলী হওয়ার দাবী করছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে ওলী নয়। অথবা দেখা যায় কোন ব্যক্তি নিজেই নিজেকে ওলী বলে দাবী করে বসেছে!।

কেউ আবার এমন অলৌকিক কিছু প্রকাশ করেছে যা কারামত নয় বরং ভেলকি দেখানো বা যাদু অথবা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। অধিকাংশ লোক যাদু ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না ফলে যে ব্যক্তি সম্মানিত নয় তাকে তারা সম্মান করে এবং এমন লোকদের অনুসরণ করে যার মাঝে অনুসরণীয় সামান্যতম গুণও নেই। বরং সে হেদায়েত হতে দূরে স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত।

এ সকল ভ্রান্তি ও ক্ষতি থাকার দরুনই সাহাবাগণ رضي الله عنهم রাসূল (ﷺ) পরবর্তী অন্য কারও মাধ্যমে বরকত অর্জন করা পরিত্যাগ করেছেন। এর যদি মূল কোন ভিত্তি থাকত তবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম করার দরুন কোন ক্ষতি আবশ্যক হতো না।

উপরোক্ত দু'টি দিকের দ্বিতীয় দিকটিই অগ্রাদিকারযোগ্য। কেননা, ইলমের মূলনীতি হতে জানা যায় প্রত্যেকটি নৈকট্যশীল আমল যা রাসূল (ﷺ)-কে দেয়া হয়েছে তা তাঁর উম্মাতের জন্য নমুনা স্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত খাসের বা নিজস্বতার প্রমাণ না পাওয়া যায়।

অপর দিকে প্রথম দিকটিও গ্রহণীয় হতে পারে। সেটা এভাবে যে, যে কাজ রাসূল (ﷺ) করেছেন কিন্তু সাহাবাগণ رضي الله عنهم করেননি সে ক্ষেত্রে যদি উক্ত কাজটি শরীয়তসম্মত বলে তাঁদের বিশ্বাস হতো তবে কিছু ক্ষেত্রে বা অবস্থাতে হলেও রাসূলের পরে সাহাবাগণের رضي الله عنهم কেউ অথবা সকলে তার উপর অবশ্যই আমল করতেন হয়তো শরীয়তের ভিত্তিতে অথবা নিষেধের দলীল না থাকার উপর নির্ভর করে। দেখুন কিতাবুল ই'তিসাম ৮ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা। বিশিষ্ট আলিম ইবনে রজব হাম্বালী রহঃ রাসূলের (ﷺ) হাদীস:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ: যে মুসলিম ব্যক্তি কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদেরই অন্তর্গত- সুনানে আবূ দাউদ ১১/৪৮।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

كَذٰلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِيْ تَعْظِيْمِ الشُّيُوْخِ وَتَنْزِيْلِهِمْ مَنْزِلَةَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

অর্থ: তেমনিভাবে শাইখদের (বিশিষ্ট ব্যক্তি, আলিম, মান্যবর ব্যক্তি) সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা এবং তাদেরকে নবীদের স্থানে বসানো সম্পূর্ণ নিষেধ। উমার رضي الله عنه, অন্যান্য সাহাবাগণ رضي الله عنهم এবং তাবিয়ীগণ তাঁদের নিকটে দুয়া চাওয়াও পছন্দ করতেন না। তাঁরা বলতেন: আমরা কি নবী? এ থেকে বুঝা যায় এ স্তরটি নবীদের জন্যই খাস। এমনিভাবে সাহাবাগণ رضي الله عنهم কেবল মাত্র রাসূলের (ﷺ) এবং তাঁর স্মৃতির মাধ্যমে বরকত অর্জন করেছেন। তাঁরা একে অপরের মাধ্যমে বরকত অর্জন করেননি। তেমনি সাহাবাগণের মর্যাদা তাবিয়ীগণের অনেক উর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও কোন তাবিয়ী সাহাবাগণের মাধ্যমে বরকত অর্জন করেননি।

উপরোক্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, রাসূল (ﷺ) ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে বরকত অর্জন করা যাবে না। যেমন: রাসূলের (ﷺ) ওযুর

ব্যবহৃত ও উদবৃত্ত পানি, তাঁর চুল, পান পাত্রের উদবৃত্ত পানি এবং তাঁর খাদ্যের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা।

মোট কথা ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা সম্মানকারী ও সম্মানকৃত উভয় ব্যক্তির জন্য ফিতনা। কেননা এতে রয়েছে মাত্রারিক্ত বাড়াবাড়ি যা মানুষকে বিদআতে প্রবেশ করায়। আবার কখনো তা শিরকের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। আহলে কিতাব (ইয়াহুদ-নাসারা) ও মুশরিকদের থেকে ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে বরকতলাভ বিষয়টি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। অথচ তা থেকে এ উম্মতকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন: পূর্বে সুনান চতুষ্টয়ে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ: যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে তাদেরই দল ভুক্ত। নিশ্চয় বার্ধক্যে উপনীত মুসলিম, ন্যায় বিচারক এবং বাড়াবাড়ি ও বিমুখতা ব্যতীত কুরআনের উপর আমল কারীগণকে সম্মান করলে প্রকারান্তরে আল্লাহকেই সম্মান করা হয়।

মাত্রারিক্ত বাড়াবাড়ি সম্মান করা খৃষ্টানদের অভ্যাস, বিমুখতা ও নিস্প্রাণতা ইয়াহুদীদের স্বভাব। মুসলমানদেরকে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থারই আদেশ দেয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী সঠিক পথের অনুসারীগণ কঠোরভাবে তাদের সম্মান করতে নিষেধ করতেন। যেমন: আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) , সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহঃ ইমাম আহমাদ রহঃ বলতেন: আমি এমন কি হয়ে গেছি যে, তোমরা আমার নিকটে আসছো? তোমরা আমার নিকট হতে চলে যাও এবং হাদীস পড় ও তা লিপিবদ্ধ কর। তিনি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে বলতেন: এ ব্যাপারে আলিমগণকে জিজ্ঞাসা কর। ধার্মিকতা ও পরহেজগারিতার কোন বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন: এ ব্যাপারে কথা বলা আমার উচিৎ নয়। অর্থাৎ এ যোগ্যতা আমার নেই অথচ জীবিত যে কোন ব্যক্তিকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে এ ব্যাপারে বলত বা তার মত পেশ করত।

একদা ইখলাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে ইমাম আহমাদ রহঃ বলেছিলেন: তুমি দরবেশ ও দুনিয়া বিরাগী লোকদের নিকটে যাও এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্ন কর। আমি এমন কি হয়েছি যে তোমরা আমার নিকটে আসছো?।

এক ব্যক্তি এসে তাঁর (ইমাম আহমাদ রহঃ'র কাপড়ে হাত বুলার পর তা দ্বারা নিজের মুখমন্ডল মাসাহ করলে তিনি খুব রাগান্বিত হন, এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন: এটা তোমরা কাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছো? দেখুন আল হুকমুল জাদিরাহ বিল ইযায়াহ ৫৪ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত আলোচনাকে আরও সুদৃঢ় করে খোলাফায়ে রাশিদার অন্যতম ব্যক্তিত্ব উমার বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক সংঘটিত দানিয়ালের লাশ সংক্রান্ত ঘটনা।

অথচ সাহাবাগণের (রাঃ) কেউ তাঁকে বাধা দেননি। অনেকের মতে তিনি (দানিয়াল) নবী ছিলেন। দানিয়ালের মৃত দেহের সাথে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এরূপ আচরণ করেছিলেন এ ভয়ে যে, মানুষেরা তার লাশ বা কবরের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা শুরু করবে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহঃ বলেন: আমি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের মাগাযী নামক গ্রন্থে ইউনুস বিন বুকাইরের অতিরিক্ত বর্ণনায় আবূ খালিদ বিন দিনারের সূত্রে উল্লেখ করেছি, তিনি বলেন: আবুল আ'লিয়া আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: আমরা যখন তুসতুর বিজয় করলাম তখন হুরমুযানের ধন ভান্ডারে একটা খাট পেলাম। তার উপরে একটা মৃত দেহ (লাশ) ছিল। তার মাথার পাশে তার একটা বই ছিল। আমরা ঐ বইটা উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে নিয়ে আসলাম, তিনি কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ডাকলেন। কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ঐ বইটা আরবীতে অনুবাদ করলেন।

আবুল আলিয়া বলেন: আরবদের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম উক্ত কিতাবখানা কুরআন পড়ার মতো পড়লাম। আবূ খালদাহ বলেন: আমি আবুল আলিয়াকে বললাম: ঐ কিতাবে কি ছিল? তিনি বললেন তোমাদের ইতিহাস ও কর্মসমূহ, তোমাদের বাচন ভঙ্গি এবং পরবর্তীতে যা কিছু হবে। আমি বললাম: আপনারা ঐ লোকটাকে কি করেছিলেন?

তিনি বললেন: আমরা দিনে বিভিন্ন স্থানে ১৩টি পৃথক পৃথক কবর খনন করলাম এবং রাত্রে তার একটিতে ঐ ব্যক্তিকে দাফন করে সকল কবরগুলোকে মাটির সাথে সমান করে দিলাম যাতে করে মানুষেরা তার কবরকে চিনে তার লাশকে উঠিয়ে না ফেলে।

আমি আবুল আলিয়াকে বললাম: তারা ঐ ব্যক্তির লাশ হতে কি আশা করত? তিনি বললেন: যখন বৃষ্টি হত না তখন তারা তার লাশ নিয়ে ফাঁকা মাঠে বের হতো এবং বৃষ্টি প্রার্থনা করত এবং তা লাভ করত। আমি বললাম: ঐ লাশটি কোন ব্যক্তির বলে আপনারা ধারণা করেন? তিনি বললেন: লোকেরা তাকে দানিয়াল বলে জানে। আমি বললাম: কত দিন

থেকে মৃত অবস্থায় আপনারা তাকে পেয়েছেন? (অর্থাৎ কত দিন থেকে তার লাশকে এ অবস্থায় রাখা হয়েছিল?)। তিনি বললেন: তিন শত বছর হতে। আমি বললাম: তার কোন কিছু পরিবর্তন হয়েছিল কি? তিনি বললেন: না, তবে কপালের চুলের সামান্য পরিবর্তন হয়েছিল। নিশ্চয় নবীদের দেহ মাটিতে পচে না এবং জংলী হিংস্র পশুতেও খায়না। উক্ত ঘটনাতে আনসার এবং মুহাজিরগণ কর্তৃক দানিয়ালের কবরকে গোপন রাখার উদ্দেশ্য হলো যাতে করে লোকেরা ঐ কবরের ফিতনায় না পড়ে। এতে বুঝা যায় যে, তাঁরা এরূপ কর্মকে (কবর বা মৃত দেহের মাধ্যমে বরকত অর্জনকে) ঘৃণা করতেন- ইক্বাতিযাউস সিরাতুল মুস্তাক্বীম ৩৩৯ পৃষ্ঠা।

যেহেতু এ কথা প্রমাণিত হলো যে, সাহাবাগণ রাসূল (ﷺ) ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে বরকত অর্জন করতেন না, তখন বিদআতী এবং অতিরঞ্জনকারীর যে সকল মিথ্যা দলীলের কথা উল্লেখ করে তার কোন মূল্যই থাকল না।

তারা বলে: ইমাম আহমাদ রহঃ ইমাম শাফিরী রহঃ এর কাপড় ধোয়া পানি পানের মাধ্যমে বরকত অর্জন করেছেন। অপর দিকে ইমাম শাফিয়ী রহঃ ইমাম আবূ হানিফাহ্ রহঃ এর কবরের মাধ্যমে বরকত হাসিল করেছেন।

বিদআতীদের উপরোক্ত মিথ্যা ঘটনাসমূহের উল্লেখের পর শাইখ আবূ বকর জাবির আল-জাযায়িরী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন: (ইমাম শাফিয়ী ও আহমাদ রহঃ এর উপর এ অপবাদ কি সত্য?) আল্লাহর শপথ! এটা সত্য নয় বরং তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ।

এ সকল মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে তারা শিরকের দিকে আহবান করছে এবং ওলী আওলিয়াদের কবরের নিকটে অবস্থান করা, তাদের কবরের মাটি শরীরে মাসাহ করা, তাদের কবরের উপর গম্বুজ বানানো, এ সূত্র ধরে এক সময় ঐ সকল মৃত আওলিয়াদের নিকটে চাওয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা, পশু যবাই ও নযরের মাধ্যমে তাদের নৈকট্য হাসিলের বৈধতার প্রমাণ করতে চায়।

পরিশেষে সাধারণ জনতা তাদেরকে নেতা, সূফী সাধক ও ওলী আওলীয়া নাম নিয়ে তাদের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা শুরু করে। হে সম্মানিত পাঠক! বিদআতীদের কর্ম কান্ড ও অবস্থানই উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ দিবে।

কোন এক ছাত্র আমাকে শপথ করে বলেছে যে, শাইখ সাইয়েদকে বাইতুল্লাহ শরীফের ইবরাহীম গেটে কোন একদিন দেখতে পায়। সে মোজা হতে তার পা বের করার সাথে সাথে তার কোন এক মুরীদ নিজের পকেট হতে রুমাল বের করে তার পা মুছে তা দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও শরীরের খোলা অংশ মাসাহ করতে শুরু করে।

এটাই হলো ব্যক্তির মাধ্যমে বরকত লাভের গোপন দাওয়াতের মূল ভেদ। যারা তা মানেনা তাদেরকে তারা কাফির, অহাবী এবং ওলী-আওলিয়ার দুশমন বলে আখ্যায়িত করে। সাইয়েদ রেফায়ী যা বলছে তা শ্রবণ করে দেখুন; পূর্বে যা উল্লেখ করেছি এর পরও কি আমাদেরকে শিরকের অপবাদ দেয়া ঠিক হবে?

আর যে ব্যক্তি রাসূলের (ﷺ) কোন স্মৃতির মাধ্যমে যেমন: তাঁর মসজিদ, মেম্বার, মেহরাব, কবরস্থ ছিদ্র ও বহিরাংশ দ্বারা বরকত অর্জন করতে চাই তাকে কি আমরা বক্র ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখব?

হে প্রিয় পাঠক! এটা কি প্রকৃত শিয়া রাফেযীর কণ্ঠ নয় যা নিজেকে সুন্নী ধারণাকারী সাইয়েদ রেফায়ীর মুখে উচ্চারিত হয়েছে? কেননা, তারাই তো স্মৃতিসমূহের নিকটে অবস্থান গ্রহণ করতঃ তথায় মাতম ও কান্না-কাটি করে থাকে।

রেফায়ী প্রথমে যা বলেছে তা ভুলে গেছে, ফলে সে শিরক ও গোমরাহীর পথে আহ্বানকারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন আমীন। সে মসজিদে নব্বীর রক্ষণাবেক্ষণকারীদের থেকে এটাই কামনা করে যে, তারা যেন তাদের (রেফায়ীদের) মাধ্যমে ধোঁকাগ্রস্থ লোকদের জন্য এ পথ উন্মুক্ত করে দেন যাতে করে তারা রাসূল (ﷺ) এর ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে তার কবরকে ইবাদাতের স্থানে রূপান্তরিত করতে পারে। রাসূল (ﷺ) আল্লাহর নিকটে দুয়া করেছেন: হে আল্লাহ তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করনা।

এ লোকটির (ইউসুফ রেফায়ী) সঠিক আক্বীদাহ বা বিশ্বাসকে কলুষতা হতে মুক্ত ও রক্ষা করা মোটেই সহ্য হয় না। এটা যেন তাকে বড়ই পীড়া দেয়। তাইতো সে বিপথগামী হয়ে চিৎকার করে বলছে: হে মদীনার লোকেরা, কেন তোমরা যিয়ারতকারী মানুষদেরকে মসজিদে নব্বীর মেম্বার, মেহরাব, দেয়াল স্পর্শ করে বরকত নিতে দিচ্ছো না?। রাসূল (ﷺ) এর স্মৃতি চিহ্ন্যের কথা বলে কেন তোমরা তাদেরকে বাধা ও ধমক দাও?

লেখক বলেন: হে রেফায়ী! তুমি মিথ্যা বলেছো। বর্তমানে তুমি রাসূলের (ﷺ) স্মৃতি চিহ্ন দেখলে? বর্তমানের মিম্বার ও রাসূলের (ﷺ) কবরের ছিদ্রপথগুলো তুর্কীদের তৈরী। আল্লাহর শপথ! এ জিনিসগুলোকে রাসূলের (ﷺ) হাত, পা, বা পবিত্র শরীর কোন কিছুই স্পর্শ করেনি। তাহলে কিসের দ্বারা মুসলমানগণ বরকত অর্জন করবে হে রেফায়ী?

তবে হে রেফায়ী শুনে রাখো! মুসলমানগণ মসজিদে নব্বীতে বেশীক্ষণ অবস্থান করা, তথায় সালাত আদায়, রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সহাবীদ্বয় আবূ বকর ও উমার (رضي الله عنهما) এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করার মাধ্যমে বরকত অর্জন করতে পারে। এছাড়া সেখানে ইবাদাতের নামে যা কিছু করা হবে তা এই রেফায়ীদের নিয়ম-নীতি, কর্ম-কান্ড এবং তাদের পক্ষ হতে স্পষ্ট বিদআত ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ তাদেরকে সত্যের দিক নির্দেশনা দিয়ে তাঁর সরল পথে ফিরে আসার তৌফীক্ব দান করুক, আমীন। দেখুন অজা-উ-ইয়ার কুযুন ৬৭ পৃষ্ঠা।

লেখক বলেন: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি তার হাত দ্বারা ইমাম আহমাদের রহঃ কাপড় স্পর্শ করে তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল মাসাহ করতে লাগলে ইমাম আহমাদ রহঃ তাকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেন।

এ থেকে বুঝা যায় বাড়াবাড়ি ও বিদআতীরা বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদের ঘটনা বর্ণনা করে যে দলীল দেয় তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কোন মুসলিম আলিমের পক্ষ হতে এরূপ বরকত অর্জনের সত্যতার কথা যদি মেনে নেয়াও হয় তবুও সাহাবাগণ رضي الله عنهم এবং তাবিয়ীগণ রহঃ কর্তৃক সৎ ব্যক্তি ও তাদের স্মৃতি চিহ্নের মাধ্যমে বরকত অর্জন পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে যে ঐক্য হয়েছে তার বিপরীতে ঐ আলিমের কথা দলীল হিসেবে গণ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ) এর সাথে অন্য কাউকেও তুলনা করা যাবে না। কেননা, নিষ্পাপতা কেবল রাসূলের ﷺ জন্য খাস । রাসূলের (ﷺ) সব কথাই গ্রহণীয়, অপর দিকে অন্যদের কথা গ্রহণীয় বা অগ্রহণীয় যে কোনটি হতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ع (٢٤٨)

অর্থ: বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ইমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। সূরাহ বাক্বারাহ আয়াত ২৪৮।

কিছু সংখ্যক লোক বলেন: এ আয়াতে সৎ ব্যক্তিদের স্মৃতি বস্তুর মাধ্যমে বরকত অর্জনের দলীল বা প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ তা ঠিক নয়।

যেমন: মুহাম্মাদ উলাবী মালিকী এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: এ আয়াতে সৎ ব্যক্তিদের স্মৃতি চিহ্নের দ্বারা অসীলা ধরা, তার দ্বারা বরকত অর্জন এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষনের প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখুন: মাফাহীম ইয়াজিবু আন্ তুসাহহিহা লিল মালিকী ১৫৩ পৃষ্ঠা।

প্রকৃতপক্ষে অত্র আয়াতে নবীগণের স্মৃতি চিহ্নের মাধ্যমে বরকত অর্জনের আলোচনা এসেছে, নবী ভিন্ন অন্যদের মাধ্যমে নয়। আর আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে নবীদের সাথে অন্যদেরকে তুলনা করা যাবে না।

ইবনে আত্বীয়াহ রহঃ বলেন: মূলতঃ আয়াতে বর্ণিত তাবুত বা বাক্সে নবীগণের অবশিষ্ট কিছু মূল্যবান সামগ্রী ও স্মৃতি চিহ্ন ছিল।

দেখুন ফাতহুল ক্বাদীর লিশ শাওকানী ১/২৬৫।

যারা পূর্বের আয়াত দ্বারা সৎ ব্যক্তিদের স্মৃতির মাধ্যমে বরকত অর্জনের দলীল দেয় তাদের প্রতিবাদে শাইখ হামুদ আত-তুওয়াই জেরী রহঃ বলেন: ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে: বিদআতী ও রেফায়ীরা বলে: কুরআন মাজীদ এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, সৎ ব্যক্তিদের অবশিষ্ট জিনিস ও স্মৃতির মাধ্যমে কল্যাণ প্রাপ্তি ও অকল্যাণ রোধের অসীলা করা যায়। তার দলীল, আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ع (٢٤٨)

অর্থ: বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে

তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাদের সন্তাবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। সূরাহ আল-বাক্বারাহ্ আয়াত নং ২৪৮।

বিদআতীদের উপরোক্ত কথার জবাব হলো: শরীয়তে মুহাম্মাদী পরিপূর্ণ, তা তার পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহকে রহিত করে দিয়েছে। অতএব, শরীয়তে মুহাম্মাদীর বিপরীত কোন কর্ম করা কারো জন্য বৈধ নয়। রাসূল (ﷺ) নিজেও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। আর সবচেয়ে বড় বাড়াবাড়ি হলো যা মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। এর মধ্যে অন্যতম হলো: সৎ ব্যক্তিদের স্মৃতি চিহ্ন ও অবশিষ্ট জিনিসসমূহের দ্বারা বরকত অর্জন করা এবং তা দ্বারা কল্যাণ প্রাপ্তি ও অকল্যাণ রোধের উপায় অনুসন্ধান করা। অথচ রাসূল (ﷺ) তাঁর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে বলে গেছেন:

عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله قال أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»

অর্থ: জুনদুব বিন আব্দিল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন: ---------- তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা (উম্মতেরা) তাদের নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করো না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি-

সহীহ মুসলিম ৩/১২৭।

ইমাম নব্বী রহঃ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: কবরকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করা ও তা নিয়ে ফিতনা থাকার ভয়েই রাসূল (ﷺ) তাঁর নিজের ও আমাদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সেটাই মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে কুফরীর দিকে টেনে নিয়ে যায় যেমনটি পূর্ববর্তী অনেক উম্মাতের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا .

অর্থ: আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে অসুখে মৃত্যুবরণ করেন সেই অবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নিজেদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণের দরুন ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হোক। সহীহুল বুখারী ৫/৯৯।

অপর হাদীসে এসেছে:

أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا

অর্থ: আয়িশা এবং ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন মৃত্যু ঘনীভূত অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটা চাদর দিয়ে বার বার মুখমণ্ডল ঢাকছিলেন। যখন অসুবিধা বোধ করতেন তখন চাদরটি তাঁর পবিত্র চেহারা হতে সরিয়ে দিতেন। এমতাবস্থাতেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, কেননা তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। বস্তুত: তাদের মতো কার্যকলাপ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহে সৎ ব্যক্তিদের স্মৃতির মাধ্যমে বরকত অর্জন এবং তাদের কবর ও মজলিসসমূহে দুয়া করা যে নিষিদ্ধ তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, এ দ্বারা তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন ও তাদের সাথে শিরক করা হয়। আর শিরকের সকল পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কবরকে উৎসবের স্থান এবং নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে যারা কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদেরকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন।

মোট কথা, মহান রব্বুল আলামীনের বাণী:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ع (٢٤٨)

অর্থ: বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী।

সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে- সূরাহ বাক্বারাহ আয়াত নং ২৪৮। অত্র আয়াতের মাঝে সৎ ব্যক্তিদের অবশিষ্ট জিনিস পত্র ও স্মৃতি চিহ্নের মাধ্যমে কল্যাণ প্রাপ্তি বা অকল্যাণ দমনের কোন প্রমাণই নেই।

আর যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, সৎ ব্যক্তিদের ঐ সকল জিনিসের মাধ্যমে কল্যাণ পাওয়া যায় বা অকল্যাণ দূর করার পক্ষে এ আয়াত প্রমাণ বহন করে, সে ব্যক্তি তিনটি হারাম বিষয়কে একত্রিত করবে।

বিষয় তিনটি নিম্নরূপ:

প্রথম: সৎ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। যা মানুষকে শিরকের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। আর রাসূল (ﷺ) সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। যেমনটি পূর্বেই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: কুরআনের ক্ষেত্রে নিজের মন গড়া কথা বলা। স্পষ্ট হাদীসে এসেছে নবী (ﷺ) বলেছেন:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া তথা না জেনে কুরআনের ব্যাপারে

কোন কথা বলে সে যেন জাহান্নামে তার বাস স্থান ঠিক করে নেয়- সুনানে তিরমিযী ১০/২০৬। ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

তিরমিযীর অপর বর্ণনায় এসেছে: যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে নিজের মন গড়া কথা বলে সে জাহান্নামে তার বাস স্থান করে নেয়। হাদীসটি হাসান। ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন: রাসূল ﷺ এর বেশ কজন বিজ্ঞ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ও অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইলম ছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর করার ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয়ত : ফিতনা-ফাসাদের উদ্দেশ্যে কুরআনের সংশয়পূর্ণ আয়াতের পিছনে পড়া এবং যে সকল মূর্খ ব্যক্তিরা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে জানেনা তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করা।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ (٧)

অর্থ: তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর।

আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন: আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তিসম্পন্ন ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না- সূরাহ্ আলু ইমরান আয়াত ৭।

নবী ও সৎ ব্যক্তিদের স্মৃতিসমুহ অনুসন্ধান না করার ব্যাপারে যে সকল দলীল এসেছে তার কিছু নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- আবূ বকর বিন আবি শাইবাহ্ স্বীয় মুসান্নাফ গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কৃত দাস নাফে'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে সংবাদ পৌঁছল যে, যে গাছের নিচে সাহাবাগণ ﷺ

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (ﷺ) এর সাথে বাইয়াতুর রিযওয়ান করেছিলেন মানুষেরা সে গাছের কাছে যায়। তখন তিনি (রাঃ) ঐ গাছটি কেটে ফেলার আদেশ দিলে তা কেটে ফেলা হয়।

ইবনে আবি শাইবাহ বিশুদ্ধ সনদে মারুর বিন সুওয়াইদ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন: একদা আমরা উমার (রাঃ) এর সাথে হজ্জে গিয়েছিলাম। ফজরের সালাতে সে হজ্জে তিনি প্রথম রাকাতে সূরা ফীল ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কুরায়শ পড়েছিলেন। হজ্জ থেকে ফিরার সময় দেখলেন লোকেরা কোথায় যাওয়ার জন্য যেন তাড়াহুড়া করছে। তিনি (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপার? গাথীরা (রাঃ) বললেন: এখানে একটা মসজিদ রয়েছে যেখানে রাসূল (ﷺ) সালাত আদায় করেছিলেন সেখানে যাওয়ার জন্য সবাই এমন তাড়া হুড়া করছে! তখন তিনি (রাঃ) বললেন: এরূপ করার কারণেই আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী-নাসারারা ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীদের স্মৃতিচিহ্নগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এ মসজিদে এসে যাদের সালাতের সময় হয়ে যায় তারা যেন এখানে সালাত আদায়, করে আর যাদের সালাতের সময় এখানে না হয় তারা যেন বরকতপূর্ণ মনে করে এখানে সালাতের জন্য অপেক্ষা না করে। যে গাছের নিচে রাসূল (ﷺ) সাহাবাগণের বাইয়াত (অঙ্গিকার) নিয়েছিলেন সে গাছের সম্মানকারী এবং রাসূল (ﷺ) যে স্থানে সালাত আদায় করেছেন সে স্থানকে সম্মানকারীদের প্রতিবাদে খোলাফায়ে রাশিদার অন্যতম উমার (রাঃ) এর এ অবস্থান।

যদি নবী ও সৎ ব্যক্তিদের স্মৃতি ও নিদর্শনসমূহকে সম্মান প্রদর্শন করা বৈধ হতো তবে উমার (রাঃ) যে গাছের নিচে রাসূল (ﷺ) এর সাথে বাইয়াত করা হয়েছে তা কেটে ফেলতেন না।

আবার, যে মসজিদে রাসূল (ﷺ) সালাত আদায় করেছেন সেখানে সালাত আদায়ের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে নিষেধ করতেন না। যারা ধারণা করে যে, সৎ ব্যক্তিদের অবশিষ্ট্য বস্তুও মাধ্যমে কল্যাণ প্রাপ্তি ও অকল্যাণ দূর করার ক্ষেত্রে অসীলা নেয়া যেতে পারে উমার (রাঃ) এর এ কথা ও কাজে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

অর্থ: ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ উমার (রাঃ) এর মুখে ও অন্তরে সত্য নাযিল করেছেন। সুনানে তিরমিযী ১২/১৪২। ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব। এ বিষয়ে ফযল বিন আব্বাস, আবূ যার ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সুনানে আবি দাউদে ও সহীহ ইবনে হিব্বানে এ হাদীসের শব্দে একটু ভিন্নতা এসেছে তা হলো:

إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهِ

অর্থ: আল্লাহ ﷻ উমারের (রাঃ) ভাষায় তথা মুখে সত্য দান করেছেন, তাই তিনি (রাঃ) সত্যই বলেন- সুনানে আবি দাউদ ৮/১৯৬। ইমাম আহমাদ স্বীয় গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে আলা লিসানে উমার অ-ক্বলবিহী শব্দ দ্বারাই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি:

عَنْ أَبِيْ ذَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ "إِنَّ اللهَ تعالى وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهِ"

অর্থ: আল্লাহ ﷻ উমার (রাঃ) এর যবানে সত্য ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি সত্য কথাই বলেন- সুনানে আবি দাউদ ৮/১৯৬।

হাকিম বলেন: বোখারী মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইমাম যাহাবী তাঁর তালখীস গ্রন্থে বলেন: মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বোখারী তাঁর তারীখ (ইতিহাস) গ্রন্থে এবং হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকে হাকিমে হুযাইফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) এর সূত্রে রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেছেন:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "اِقْتَدُوْا بِاللَّذِيْنَ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ. شرح مشكل الآثار ٣/٢٥٩

অর্থ: আমার পরবর্তী দুই ব্যক্তি তথা আবূ বকর ও উমার (রাঃ) এর তোমরা অনুসরণ করবে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান এবং ইমাম

হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন। ইমাম আহমাদ ও সুনান চতুষ্টয়ের লেখকগণ, ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ ইবনে হিব্বানে এবং হাকিম স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে ইরবায বিন সারিয়ার (ﷺ) সূত্রে রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেছেন:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " . قال الشيخ الألباني : صحيح

অর্থ: তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত, রীতি ও পথকে মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে ধারণ কর। ধর্মের মাঝে নতুন কিছু সংযোজন করা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুনত্বই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা- সুনানে আবি দাউদ ১২/২১১।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ এবং হাকিম, ইবনে আব্দিল বার ও যাহাবীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন আল-ইজাবাতুল জালিইয়্যাহ আলাল আস ইলাতিল কুয়েতিয়্যাহ ১৬ ও তৎ পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

পূর্বে উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমাদের সামনে এ কথাই স্পষ্ট হয় যে, নবীগণ ব্যতীত সৎ ব্যক্তিদের স্বীয় সত্ত্বা (যাত) ও স্মৃতি চিহ্নের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা জায়িয বা বৈধ নয়। কেননা, এ মর্মে শারয়ী কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। তাছাড়া সকল সাহাবাগণ ﷺ তা পরিত্যাগ করেছেন। এ ছাড়াও এতে সীমালঙ্ঘন ও অতিরঞ্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায় যা মানুষকে শিরক ও বিদআতের পথে নিয়ে যায়।

এতে বরকত অর্জনকারীর ঈমান ও বিশ্বাস ঠিক থাকে, ফলে সে আল্লাহ ছাড়া কারও সাথে তার অন্তরকে সম্পর্কিত করে না।

কারণ এক মাত্র আল্লাহই উপকার ও ক্ষতির মালিক। কেবল মাত্র তিনিই কোন কিছু কাউকে দেন বা কাউকে কোন কিছু হতে বঞ্চিত করেন।

এতে রয়েছে বরকত অর্জনকারীর ধর্মের সংরক্ষণ যাতে করে ধোঁকাবাজ ও বরকত অর্জনকারীরা তাকে আকর্ষণ করতে না পারে। আর আকর্ষণ করলেই সে নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের ধারণা করতে থাকে। সাহাবাগণ ﷺ বাতিলের এ পথকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছেন। আল্লাহ ﷻ সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত। আল-হামদুলিল্লাহ।

উপসংহার

আল্লাহর রহমতে এ মূল্যবান গ্রন্থখানা শেষ করা সম্ভব হলো। বইটির মূল সারাংশ নিম্নরূপ:

১। জাহিলিয়াতের প্রথম যুগে মূর্তির নিকটে বরকত চাওয়াই মানুষকে তার (মূর্তির) ইবাদাত ও তার উদ্দেশ্যে নযর মানত করার প্রতি ধাবিত করেছে।

২। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৎ লোকেদের স্বীয় সত্ত্বা (যাত), স্মৃতি, তাদের বাসস্থান, কবর ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত সময়ের দ্বারা বরকত অর্জন করার কারণেই রাফেযী ও সূফীরা বেশীর ভাগ শিরক-বিদআতে পতিত হয়েছে।

৩। শরীয়তসম্মত বরকত অর্জন সেটাই যা রাসূল ﷺ ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণ رضي الله عنهم থেকে প্রমাণিত।

৪। কিছু ব্যক্তি, স্থান ও সময়ে আল্লাহ ﷻ বরকত দান করেছেন। ঐ সকল বরকত অর্জন করতে হলে রাসূল ﷺ এর দেয়া শরয়ী পদ্ধতিতেই তা অর্জন করতে হবে।

৫। বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে নবীগণের সাথে সৎ ব্যক্তিদের তুলনা করা ঠিক নয়। সাহাবা ও তাবিয়ীগণ رضي الله عنهم তা করেন নি।

৬। কোন সময় বা স্থানের মর্যাদা বর্ণনা করা হলেই যে তার মাধ্যমে বরকত অর্জন করতে হবে এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। তবে শরীয়ত যে সময় ও স্থানে বরকত অর্জন বৈধ করেছে তাতে শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে (বরকত তালাশে) কোন অসুবিধা নেই। আল-হামদুলিল্লাহ।